মহানবী

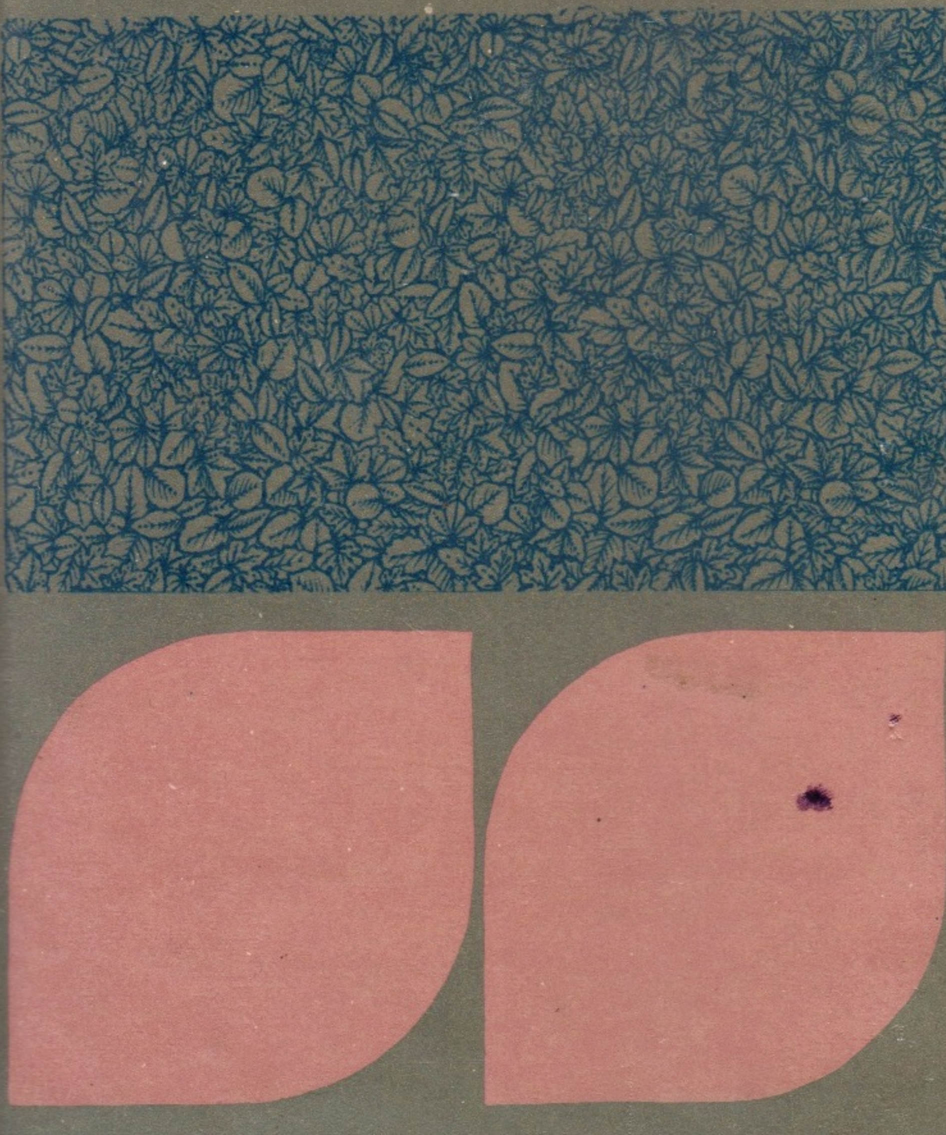

মহানবী

মুহম্মদ নূরুল হুদা

বাংলা একাডেমী ঢাকা

বাএ ৩৩২৫

প্রথম প্রকাশ : ১২ই রবিউল আওয়াল ১৪০৪/২রা পৌষ ১৩৯০/ডিসেম্বর ১৯৮৩। প্রকাশক : পরিচালক, ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও পত্রিকা বিভাগ। প্রথম পুনর্মুদ্রণ : জমাদিউল আওয়াল ১৪১৩/অগ্রহায়ণ ১৩৯৯/নভেম্বর ১৯৯২। প্রকাশক : উপপরিচালক, বিপণন ও বিক্রয়োন্নয়ন উপবিভাগ, [পুনর্মুদ্রণ প্রকল্প] বাংলা একাডেমী, ঢাকা। দ্বিতীয় পুনর্মুদ্রণ : শাবান ১৪১৭/ মাঘ ১৪০২/জানুয়ারি ১৯৯৬। প্রকাশক : পরিচালক, প্রাতিষ্ঠানিক পরিকল্পনা ও প্রশিক্ষণ বিভাগ, [পুনর্মুদ্রণ প্রকল্প] বাংলা একাডেমী, ঢাকা। মুদ্রক : আশফাক-উল-আলম, ব্যবস্থাপক বাংলা একাডেমী প্রেস, ঢাকা। প্রচ্ছদ : কাজী হাসান হাবিব। মুদ্রণ সংখ্যা : ২২৫০ কপি। মূল্য : ৫০·০০ টাকা।

MAHANOBI [A biography of Hazrat Muhammad (Sm) for juveniles : by Mohammad Nurul Huda, Published by Bangla Academy, Dhaka, Bangladesh. Second Reprint January 1996. Price : Tk. 50.00 only.

ISBN 984-07-3334-6

মহানবী

উৎসর্গ

আব্বা ও আম্মা

পুনর্মুদ্রণ প্রসঙ্গে

বাংলাভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও গবেষণায় নিয়োজিত বাংলাদেশের জাতীয় প্রতিষ্ঠান বাংলা একাডেমী বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানও বটে। ১৯৫৭ সাল থেকে বাংলা একাডেমী গ্রন্থ প্রকাশ করে আসছে। জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় একাডেমী এ-যাবৎ প্রায় সাড়ে তিনহাজার গ্রন্থ প্রকাশ করেছে। এই বিপুল গ্রন্থসম্ভারের মধ্যে বেশ কিছু গ্রন্থ সাধারণ পাঠক ও ছাত্রসমাজের কাছে বিশেষভাবে আদৃত হয়েছে। পাঠকনন্দিত এইসব বই বাংলা একাডেমী পরিকল্পিতভাবে পুনর্মুদ্রণ করে চলেছে। ১৯৯১ সাল থেকে পুনর্মুদ্রিত গ্রন্থসমূহের প্রকাশনার যাবতীয় কাজ কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক গঠিত 'পুনর্মুদ্রণ প্রকল্প'-এর অধীনে নিষ্পন্ন হয়ে আসছে।

মুহম্মদ নূরুল হুদা প্রণীত 'মহানবী' গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৮৩ সালে এবং প্রথম পুনর্মুদ্রণ হয় ১৯৯২ সালে। হযরত মুহম্মদ (সঃ) এর জীবনী নিয়ে স্বল্প পরিসরে রচিত কিশোরোপযোগী এই গ্রন্থ। সহজ-সরল, সাবলীল ও ছন্দময় ভাষায় রচিত এই গ্রন্থ ইতোমধ্যেই কিশোর-কিশোরীদের নিকট সমাদৃত হয়েছে। তাঁদের চাহিদার কথা বিবেচনা করে গ্রন্থটি পুনর্মুদ্রণ করা হলো।

আশা করি এই বই তাঁদের উপকারে আসবে।

মনসুর মুসা
মহাপরিচালক
বাংলা একাডেমী

পুনর্মুদ্রণ প্রসঙ্গে

বাংলা একাডেমী প্রকাশিত বইয়ের পুনর্মুদ্রণের কাজটি ইতিপূর্বে বিভিন্ন বিভাগ থেকে করা হতো। এর কোন প্রয়োজন বা চাহিদাভিত্তিক প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ছিল না।

বিপণন ও বিক্রয়োন্নয়ন উপবিভাগ সরাসরি বইপত্র বিপণনের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকার কারণে একাডেমী প্রকাশিত কোন্ বই বেশী পাঠকনন্দিত, কোন্ বই ছাত্রসমাজের কাছে বিশেষভাবে আদৃত সে সম্পর্কে সমধিক ওয়াকিফহাল থাকায়, পুনর্মুদ্রণ কর্মটি বিওবি উপবিভাগের দায়িত্বে সম্পাদিত হলে কাজের সমন্বয় সাধন, প্রকাশনার দ্রুত ব্যবস্থাগ্রহণ, ক্রেতা সাধারণের চাহিদা মোতাবেক দ্রুত বাজারজাতকরণের পদক্ষেপ গ্রহণ ইত্যাকার বিষয় ত্বরান্বিত হবে বিবেচনা করে কার্যনির্বাহী পরিষদ বিওবি'র আওতায় 'পুনর্মুদ্রণ প্রকল্প' নামে একটি 'কোষ' গঠন করে।

নবগঠিত পুনর্মুদ্রণ প্রকল্প চলতি অর্থ বছরের ছাত্রছাত্রীদের পাঠ্যভুক্ত গ্রন্থ ব্যতীতও পাঠকনন্দিত উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কিত গ্রন্থ পুনর্মুদ্রণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। তারই ফলশ্রুতি এই গ্রন্থ। যাঁদের জন্য গ্রন্থটি প্রকাশিত হলো তাঁদের উপকারে আসলে বাংলা একাডেমী শ্রম সার্থক হবে বলে মনে করবে।

মোহাম্মদ হারুন-উর-রশিদ
মহাপরিচালক
বাংলা একাডেমী

১৯৮৩ সালের ১৮ই ডিসেম্বর, ১২ই রবিউল আওয়াল, ঈদ–ই–মিলাদুন্নবী। এই উপলক্ষে বাংলা একাডেমী হযরত মুহম্মদের (সঃ) একটি কিশোরপাঠ্য জীবনী প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নেয়। গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপি প্রণয়নের দায়িত্ব দিয়ে একাডেমী কর্তৃপক্ষ আমাকে বিশেষভাবে গৌরবান্বিত করেছেন।

অত্যন্ত কম সময়ে, মাত্র তিন সপ্তাহের মধ্যে, আমাকে পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করতে হয়েছে। বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হযরতের বেশকিছু জীবনীগ্রন্থ থেকে আমি সাহায্য নিয়েছি। এগুলোর মধ্যে কবি গোলাম মোস্তফার 'বিশ্বনবী', মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ–র 'মোস্তফা–চরিত' এবং জনাব মোবিনুদ্দিন আহমদ জাহাঁগীর–নগরীর 'নবীশ্রেষ্ঠ' থেকে বেশকিছু উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছি। তাঁদের কাছে আমার ঋণ অপরিশোধ্য।

পাণ্ডুলিপি প্রণয়নের সময় জনাব বশীর আলহেলাল, কবি আসাদ চৌধুরী ও জনাব সুব্রত বড়ুয়া আমাকে নানাভাবে সাহায্য করেছেন। গ্রন্থটির মুদ্রণ–কাজ তত্ত্বাবধান করেছেন আমার সহকর্মী জনাব এহসান চৌধুরী ও জনাব আবদুর রহমান। বাংলা একাডেমী প্রেসের ব্যবস্থাপক জনাব ওবায়দুল ইসলাম অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে গ্রন্থটি মুদ্রণের ব্যবস্থা করেছেন। আন্তরিকভাবে সাহায্য করেছেন জনাব মুস্তাফা পান্না এবং বাংলা একাডেমী প্রেসের সকল স্তরের কর্মচারীবৃন্দ। তাঁদের সকলকে জানাই গভীর কৃতজ্ঞতা।

এ গ্রন্থ রচনায় আমাকে শুরু থেকে অনুপ্রাণিত করেছেন কবি মনজুরে মওলা। তাঁর প্রতি রইলো আমার শ্রদ্ধা।

কক্সবাজার
১৮ই ডিসেম্বর ১৯৮৩

মুহম্মদ নূরুল হুদা

সূর্যোদয়ের তখনো কিছু বাকি।
আরব-মরুর দিগন্ত-বিস্তৃত প্রান্তর জুড়ে
তখনো অন্ধকারের প্রগাঢ় হাতছানি।
বিশ্ব-প্রকৃতি তখনো গভীর নিদ্রামগ্ন।
চারপাশে নিরব-নিথর নিস্তব্ধতা।

তবু জেগে আছে কিছু শব্দ।
মরু-বালুকার শরীরে শিশির-পতনের মতো কিছু শব্দ।
ঘুমন্ত পাখির সহসা পাখা সঞ্চালনের মতো কিছু শব্দ।
স্বপ্ন-তাড়িত মানুষের পাশ-ফেরার মতো কিছু শব্দ।

অপূর্ব এ দৃশ্য, অপরূপ এ সন্ধিক্ষণ।
একদিকে যাই-যাই করছে অন্ধকার,
অন্যদিকে শুরু হচ্ছে আলোর উন্মীলন।
ঘুমন্ত পশু-পাখি প্রস্তুতি নিচ্ছে জেগে ওঠার।
মানুষগুলো শয্যায় আড়মোড়া ভাঙছে।

আলো-আঁধারির সেই মিলন-মুহূর্তে
সহসা অসহ্য ব্যথায় কঁকিয়ে উঠলেন এক নারী।
তাঁর অস্তিত্বের বৃন্ত-মূলে কে যেন প্রবলভাবে মোচড় দিয়ে গেলো।
এক প্রচন্ড ধাক্কায় কেঁপে উঠলো তাঁর সমস্ত শরীর।
তিনি যেন সত্তান্তরিত হলেন।

তার আগে তিনিও ছিলেন নিদ্রামগ্ন।
কিন্তু স্বপ্নহীন ছিল না তাঁর সেই ঘুম।
সারা রাত স্বপ্নের মোহন রাজ্যে
ভ্রমণ সেরে এখন তিনি ফিরে
এসেছেন ধুলো-মাটির পৃথিবীতে।
তার দেহে-মনে বেদনা ও পুলকের এক
অপূর্ব শিহরণ।

না, তেমন কোনো অদ্ভুত স্বপ্ন তিনি দেখেন নি।
দেখেন নি কোনো অলৌকিক পরীর জগৎ।
দেখেন নি সাতসাগর তেরনদী পারের কোনো তেপান্তরের মাঠ।

তিনি স্বপ্ন দেখেছেন শুধু আলোকের।
সমস্ত পৃথিবী ভেসে যাচ্ছে যেন আলোয়-আলোয়।
দিগন্ত-বিস্তৃত মরু-বালুকার কণায় কণায় আলোর বিচ্ছুরণ।
মানুষের হাতে হাতে আলোকের শামাদান।
পশু, পাখি, গাছপালা, নর, নারী — প্রত্যেকেই যেন
এক একটি আলোকপিন্ড।
এক অন্তহীন উৎস থেকে অনর্গল ধারায়
উচ্ছ্বিত হচ্ছে আলোকের ঝর্ণাধারা।

এই তো খানিক পরেই উদিত হবে সূর্য;
এই তো খানিক পরেই পৃথিবী প্লাবিত হবে আলোক-বন্যায়।
রমণীর স্বপ্ন কি সেই আসন্ন আলোক-বন্যারই সংকেত মাত্র?

সুবেহ্-সাদিকের পূর্ব মুহূর্তে সম্পূর্ণ জেগে উঠলেন তিনি।
না, তাঁর পক্ষে আর ঘুমানো সম্ভব নয়।
তাঁর শরীরে ক্রমেই প্রবলতর হচ্ছে ব্যথার কুন্ডলী;
কিন্তু মনে হচ্ছে, কেমন যেন পরিচিত সেই ব্যথা।

তিনি বুঝতে পারলেন, এক নতুন পরিচয়ে
তিনি আজ পরিচিত হবেন। তিনি
বুঝতে পারলেন, তিনি আজ মাতৃত্বের দুয়ারে পা রাখবেন।
দীর্ঘদিন যে শিশু বেড়ে উঠেছে তাঁর অস্তিত্বের
উৎস-মূলে, সেই শিশু আজ ধরণীর
মুখ দেখতে চায়। এইতো সেই স্বপ্ন,
এই তো সেই আলোক, এই তো তাঁর সেই আকাঙ্ক্ষিত
ঘরের জ্যোতি। অন্তহীন ব্যথার মধ্যেও
আনন্দ-অশ্রুতে পূর্ণ হয়ে উঠলো তাঁর বুক।

সুবেহ্‌-সাদিকের মুহূর্তেই রমণী মা হলেন।
এতদিনকার আমিনা হলেন মা আমিনা।

যুগ যুগ ধরে নারী হয়েছে মা।
যুগ যুগ ধরে নতুন শিশু আলোকিত করেছে মানুষের ঘর।
এ দৃশ্য সনাতন, তবুও নতুন।
এ দৃশ্যের জন্যে বার বার নতুনভাবে উদগ্রীব হয়ে ওঠে
সমগ্র বিশ্ব-চরাচর।

২

দিনটি ছিল সোমবার।
মাস রবিউল আউয়াল।
কিন্তু তারিখটি কত?
১২ই রবিউল আউয়াল ৫৭০ খৃস্টাব্দ।
আসলে আমাদের সবার কাছে এই দিনটিই সবচেয়ে প্রিয়; বলা
যায়, সবচেয়ে পরিচিত।

কিন্তু এ নিয়ে একটু মতভেদ আছে।

তাবারি, খলদূন, এবনে-হেশাম, কামেল প্রমুখ
প্রখ্যাত মনীষীরা বলেন, ১২ই রবিউল আউয়াল।
কিন্তু আবুল ফেদা বলেন, ১০ই রবিউল আউয়াল।
মিসরের সুপ্রসিদ্ধ আলেম মাহমুদ পাশা ফালকী
বলেন, ৯ই রবিউল আউয়াল।
'মোস্তফা-রচিত'-এর স্বনামখ্যাত লেখক মওলানা
মোহাম্মদ আকরম খাঁ বলেন,
"সোমবার, ৯ই রবিউল আউয়াল, ২০শে এপ্রিল ৫৭১ খৃষ্টাব্দ,
১লা জ্যৈষ্ঠ, ৬২৮ সংবৎ, ব্রহ্ম-মুহূর্তে বা ছোবহ্‌-ছাদেকের
অব্যবহিত পরে জন্মগ্রহণ করিলেন।"

সে যা-ই হোক, এই তারিখটি যে ৮ই রবিউল আউয়াল থেকে ১২ই রবিউল আউয়ালের মধ্যে সীমাবদ্ধ, এ সম্পর্কে সব পন্ডিতই মোটামুটি একমত।

আমাদের প্রিয় নবীর জন্ম-তারিখ নিয়ে এই মতবিরোধের কারণ, সে সময় আরবে হয়তো শিশুর জন্ম-তারিখ লিখিতভাবে সংরক্ষণ করার রেওয়াজ ছিল না।

৩

শিশুর জন্মের সময় সূতিকা-গৃহে কোনো পুরুষের উপস্থিতি ছিল না। থাকার রেওয়াজও ছিল না। বিবি আমেনার পরিচর্যার জন্য সে-সময় যে সব মহিলা সূতিকা-গৃহে ছিলেন. তাঁদের মধ্যে ছোওয়ায়বা নামক একজন ক্রীতদাসীও অন্যতম। সদ্যোজাত শিশুকে এই ছোওয়ায়বা-ই সর্ব প্রথম পান করান স্তন্যদুগ্ধ। অর্থাৎ ছোওয়ায়বা-ই এই সদ্যোজাত শিশুর প্রথম ধাত্রী, প্রথম দুধ-মা।

কথিত আছে, সূতিকা-গৃহে ছোওয়ায়বা এই শিশুকে দু একবার বা দু একদিন মাত্র দুগ্ধ পান করিয়েছিলেন। অথচ বড় হয়ে এই শিশু সারাজীবন এই ছোওয়ায়বার কথা, তাঁর প্রথম দুধ-মা'র কথা শ্রদ্ধাভরে স্মরণ রেখেছিলেন। উপকারীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন তাঁর চরিত্রের অন্যতম বিশেষত্ব।

৪

শিশুর মাতার নাম আমিনা, পিতার নাম আবদুল্লাহ্। আবদুল্লাহ্ তাঁর পিতা আবদুল মোত্তালিবের দশ-পুত্রের মধ্যে কনিষ্ঠ সন্তান। আবদুল্লাহ্ যখন বিশ বছরের সুঠাম যুবক, তখনই কোরেশ বংশের বনিযোহ্‌রা গোত্রের ওহাবের কন্যা আমিনার সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। রূপে, গুণে আমিনা ছিলেন অতুলানীয়া।

বিয়ের কিছুদিন পরেই ডাক এলো বাণিজ্যের।

বাণিজ্য ব্যপদেশেই আবদুল্লাহ্ সিরিয়ার উদ্দেশ্যে কাফেলা সাজালেন। ইতোমধ্যে তাঁর নববধু আমিনার গর্ভে ভ্রূণের সঞ্চার হয়েছে। সিরিয়ায় গেলেন বটে, কিন্তু আবদুল্লাহ্ র মন যেন ঘরেই পড়ে রইলো। অল্প কিছুদিনের ভেতরেই তিনি বাণিজ্যের পাঠ চুকিয়ে ফেললেন। অতঃপর ঘরে ফেরার পালা।

ঘরে তাঁর গুণবতী বধূ, গর্ভে তাঁর অনাগত সন্তান। প্রেমে ও স্নেহে সিক্ত হয়ে উঠলো তাঁর অন্তর। কিন্তু বিধির ইচ্ছা যে অন্যরূপ!

সিরিয়া থেকে ফেরার পথে শ্রান্ত-ক্লান্ত আবদুল্লাহ্ কিছুদিন বিশ্রাম নিচ্ছিলেন মদিনা নগরে। আর ঠিক তখনি তিনি আক্রান্ত হলেন কঠিন পীড়ায়। পিতা আবদুল মোত্তালিব রুগ্ন পুত্রকে নিয়ে আসার জন্য মদিনায় পাঠালেন জ্যেষ্ঠ পুত্র হারিসকে। কিন্তু হারিস ফিরে এলেন একা, সঙ্গে নিয়ে এলেন এক নিদারুণ মৃত্যু সংবাদ।
'বেদনার অমৃত মুখে' নিয়ে মাতৃগর্ভেই শিশুটি পিতৃহীন হলো।

শিশুর জন্মের সময় পিতামহ আবদুল মোত্তালিব ছিলেন কাবা-মসজিদে। সেখানে তিনি কোরেশ দলপতিদের সঙ্গে আলাপ করছিলেন। বিধবা পুত্রবধূ আমিনার গর্ভে পুত্র সন্তান হওয়ার সংবাদ শুনে তাঁর হৃদয় এক অভূতপূর্ব পুলকে ভরে উঠলো।
মুহূর্তেই তিনি বিস্মৃত হলেন পুত্রশোক।
সদ্যোজাত শিশুর মধ্যেই তিনি যেন দেখতে পেলেন পুত্রের প্রিয় প্রতিচ্ছবি।
বয়স তাঁর আশি বছরেরও বেশী। কিন্তু তাতে কি। একজন যুবকের মতো দৃঢ় পায়ে তিনি এগিয়ে চললেন গৃহের পানে। ঘরে এসে সোজা ঢুকে পড়লেন সূতিকাগারে। সদ্যোজাত শিশুকে কোলে নিয়ে আনন্দের অশ্রুবানে ভিজিয়ে তুললেন শ্বেতশুভ্র শ্মশ্রু।
তারপর সোজা বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে।
শিশুকে কোলে নিয়ে প্রবেশ করলেন কাবাগৃহে।

পিতৃহীন এই এতিম শিশুর মঙ্গল-কামনায় বৃদ্ধের দুই হাত উর্ধ্বে উত্তোলিত হলো।

৫

একে একে অতিবাহিত হলো সাত-সাতটি দিন।
তখনো শিশু শিশুই মাত্র।
তখনো তাঁর কোন নামকরণ হয় নি।
অবশেষে আরবের প্রচলিত প্রথা অনুসারেই শিশুর নাম রাখার ব্যবস্থা হলো। আয়োজন হলো উৎসবের। এই উৎসবের নাম আকিকা উৎসব। সপ্তম দিনে গর্বিত ও প্রসন্ন পিতামহ আবদুল মোত্তালিব আত্মীয়-স্বজনকে আকিকা উৎসবে নিমন্ত্রণ করলেন। সাধ্যমতো আদর-আপ্যায়নের ব্যবস্থা হলো। আহারাদি সমাপন করার পর শিশুর নাম রাখার পালা। উৎসবে উপস্থিত ছিলেন কোরেশ বংশের প্রায় প্রতিটি দলপতি ও প্রধান ব্যক্তি।

তাঁরা বৃদ্ধ আবদুল মোত্তালিবকে জিজ্ঞেস করলেন শিশুর নাম। ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করে হর্ষোৎফুল্ল আবদুল মোত্তালিব স্বতঃস্ফূর্তভাবেই বলে উঠলেন, 'মুহম্মদ'।
মুহম্মদ!
এ তো বড় অদ্ভুত নাম!
এ তো বড় অচেনা নাম!
বাহ্, বড্ড মিষ্টি নাম তো!

নাম শুনেই সকলের মধ্যে গুঞ্জন শুরু হলো।
সকলের মুখে এক কথা ; এমন নাম তো
আগে শুনি নি। এ তো এক আলাদা শব্দ।
এ গোত্রে তো এমন নাম আগে কখনো ছিল না।
'নামে এতো মধু আছে কে জানিত আগে।'

কোরেশ-প্রধানগণ বৃদ্ধ আবদুল মোত্তালিবকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ
এমন অদ্ভুত নাম রাখার কারণ কী?
যেন ঠিক এই প্রশ্নেরই অপেক্ষায় ছিলেন বৃদ্ধ পিতামহ।
প্রশ্ন শুনেই তাঁর প্রশান্ত সৌম মুখমন্ডলে
ছড়িয়ে পড়লো আলোর আভা। কাল-বিলম্ব
না করে প্রত্যয়-দৃঢ় কণ্ঠে তিনি জবাব দিলেন ঃ
অমি চাই, আমার এই পিতৃহীন পৌত্র
যুগ যুগ ধরে প্রশংসিত হোক পৃথিবীর সর্বত্র ;
জগতে তাঁর প্রশংসা চির-অমলিন হয়ে থাক।

বৃদ্ধের এই উদাত্ত কামনার সঙ্গে কণ্ঠ মেলালেন উপস্থিত সবাই।
সেই দিন থেকেই শিশুর নাম হলো,
মুহম্মদ।
'মুহম্মদ' অর্থ
'প্রশংসিত।'

৬

শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার আগে আসন্ন-প্রসবা আমিনা প্রায়ই একটি স্বপ্ন দেখতেন।
বড় অদ্ভুত সেই স্বপ্ন।
তিনি দেখতেন, এক প্রশান্ত-মূর্তি দেবদূত তাঁকে বলছেন, 'হে আমিনা, তোমার গর্ভে আসছেন এক অসাধারণ সন্তান। ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর তুমি তাঁর নাম রেখো, 'আহমদ'।'
'আহমদ' অর্থ প্রশংসাকারী।
স্বপ্নের সেই দেবদূতের পরামর্শ অনুসারে বিবি আমিনা শিশুর নাম রাখলেন 'আহমদ'।

কী অপূর্ব মিল।
মুহম্মদ ও আহমদ।

প্রশংসিত ও প্রশংসাকারী।
এই দুইটি নামেরই উল্লেখ আছে পবিত্র বাইবেলে ও পবিত্র কোরআনে।

সমাপ্ত হলো শিশুর নামকরণ পর্ব।
অতঃপর ঐদিনই শিশুকে খৎনা করানো হলো।

৭

কোরেশ বংশ।
মক্কা তথা সমগ্র আরব-ভূমির একটি সম্ভ্রান্ত, অথচ শক্তিশালী সম্প্রদায়।
শৌর্যে-বীর্যে ধনে-সম্পদে তাদের তুলনা মেলা ভার।
তাদের মুখের ভাষা সমগ্র আরব-ভূমিতে অভিজাত ভাষা হিসেবে পরিগণিত।
পবিত্র কাবা ঘরের তারাই রক্ষক।
আর এহেন এক অভিজাত বংশেই জন্ম নিলেন শিশু মুহম্মদ।
তাঁর পূর্বপুরুষ সম্পর্কে আরেকটু বিস্তারিত তথ্য দেয়া যাক।
হযরত ইব্রাহীমের জ্যেষ্ঠ পুত্র হযরত ইসমাঈল। হযরত ইসমাঈলের সম্প্রদায়ই বনী ইসমাঈল। বনী ইসমাঈল দ্বাদশ সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে আরবের বিভিন্ন জায়গায় বসতি স্থাপন করে।

হযরত ইসমাঈলের দ্বিতীয় পুত্র কিদার। কিদারের বংশধরেরা মক্কা ও মক্কার পার্শ্ববর্তী হিজাজ ভূমিতে বসবাসরত। কিদারের বংশে আদ্নান্, আর আদ্নানের বংশেই জন্ম গ্রহণ করেন হযরত মুহম্মদ মোস্তফা (সাল্লাল্লাহু আলায়হেসসালাম)। হযরতের বংশ-লতিকা সংক্ষেপে নিম্নরূপ ঃ
হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা পিতা
আবদুল্লাহ পিতা আবদুল মোত্তালিব পিতা
হাশিম পিতা আব্‌দ্‌ মন্নাফ পিতা

কুসাই পিতা কিলাব পিতা মোররাহ্ পিতা
কা'ব পিতা লোওয়া পিতা গালিব পিতা
ফিহির পিতা মালিক পিতা নযর (কোরেশ) পিতা
কানানাহ্ পিতা খুজায়মা পিতা মুদরিকা পিতা
ইলিয়াস পিতা মোজার পিতা নাজার পিতা
মাআ'দ পিতা আদনান্।

অর্থাৎ হযরত মুহম্মদ (সঃ) হযরত ইসমাঈলের বংশধর আদনানের ২২তম অধঃস্তন পুরুষ।

৮

আকিকা উৎসবের পর শিশু মুহম্মদের লালন-পালনের পর্ব। সে সময় আরবের সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান পালনের জন্য ধাত্রী নিয়োগের রেওয়াজ ছিল। এই ধাত্রীদের অধিকাংশই বেদুঈন বংশোদ্ভূত।

মুহম্মদের জন্মের কিছুদিন পর মরুভূমি থেকে বেদুঈন ধাত্রীরা এলো মক্কা নগরীতে। সচ্ছল ঘরের শিশু লালন-পালন করে দু'পয়সা রোজগার করাই ওদের প্রধান উদ্দেশ্য। কাজেই ওরা প্রত্যেকে খুঁজে খুঁজে অপেক্ষাকৃত অবস্থাপন্ন ঘরের সন্তানদের প্রতিপাললের ভার নিলো। আবদুল মোত্তালিবের পরিবারের আর্থিক অবস্থা তখন নানা কারণে খুব ভাল নয়। টিকে আছে শুধু আভিজাত্য। তার উপর, শিশুটি জন্মেই পিতৃহীন। কাজেই তাঁর দিকে সহজে কোনো ধাত্রীর চোখ পড়লো না।

প্রত্যেক ধাত্রীই এক একটি সন্তানের ভার পেলো, শুধু বাকী রইলেন হালিমা। হালিমা কোরেশ বংশের বনি সা'আদ গোত্রের মেয়ে। একটি বিশেষ কারণে সারা আরবে এই গোত্রের লোকজন বিখ্যাত ছিল। সেটি হলো, তাদের অদ্ভুত সুন্দর কথাবার্তা। তাদের মুখের উচ্চারণ ছিল সুললিত ও নিখুঁত, তাদের ভাষা ব্যবহার বিশুদ্ধ ও ব্যাকরণ-সম্মত। তারা মার্জিত-রুচি ও উন্নত-মনা। কাব্য ও সংস্কৃতি-চর্চার জন্য তারা আরবে সকলের শ্রদ্ধার পাত্র।

মক্কায় তাদের অবস্থানের দিন ফুরিয়ে এলো, অথচ হালিমার ভাগ্যে তখনো কোনো সচ্ছল শিশু জুটলো না। অবশেষে হালিমা ও তাঁর স্বামী পরামর্শ করলেন, শূন্যহাতে ফেরার চেয়ে এতিম শিশু মুহম্মদের প্রতিপালনের ভার নেওয়াই শ্রেয়তর।

হালিমার হাতে নিজ সন্তানের প্রতিপালনের ভার দিতে পেরে বিবি আমিনা যুগপৎ আনন্দ ও বেদনায় শিহরিত হলেন। আনন্দ এই কারণে যে, বনি সা'আদ গোত্রের মার্জিত রুচির পরশে তাঁর সন্তান একজন সত্যিকারের রুচিবান মানুষ হিসেবে গড়ে উঠার সুযোগ পাবে। বেদনা এই কারণে যে, বিদায়ী শিশুর চাঁদ–মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে জননীর তৃষ্ণা আর মেটে না।

শিশু মুহম্মদকে হালিমা ঘরে নিয়ে এলেন। কিন্তু কী আশ্চর্য, শিশু মুহম্মদ ঘরে আসার পর পরই হালিমার পরিবারে যেন আনন্দের বন্যা বইতে শুরু করলো। হালিমা অবাক হয়ে লক্ষ্য করলেন, তাঁর গৃহপালিত পশুগুলি দিনে দিনে তাজা হয়ে উঠছে আর আগের চেয়ে বেশী দুধ দিচ্ছে। তাঁর খেজুর গাছে খেজুরের ফলন গেল–বছরের চেয়ে অনেক বেশী।

আরো একটি বিশেষ ব্যাপার লক্ষ্য করে হালিমা অভিভূত হলেন। তিনি দেখলেন, শিশু মুহম্মদ হালিমার একটি স্তন থেকেই দুগ্ধ পান করেন। অন্য স্তনটি হালিমার নিজ সন্তানদের জন্য দুগ্ধ–ভরপুর থেকে যায়।

সব দেখে হালিমা ভাবলেন, এই শিশু নিশ্চয়ই তাঁর জন্য সৌভাগ্যের বাহক। কাজেই হালিমা প্রথম থেকেই শিশুর প্রতি বিশেষভাবে মনোযোগী হলেন।

হালিমার ছিল চার সন্তান ঃ এক পুত্র ও তিন কন্যা। পুত্রের নাম আবদুল্লাহ আর কন্যাদের নাম আনিসা, হোজায়ফা ও শায়েমা। শায়েমার বয়স তখন সাত কি আট। শিশু মুহম্মদের প্রতি শায়েমার টান ছিল প্রবল। সে তাঁকে আপন সহোদরের চেয়ে বেশি স্নেহ করতো। শিশু মুহম্মদকে কোলে দোলাতে দোলাতে শায়েমা প্রায়ই ছড়া কেটে কেটে তাঁর কল্যাণ কামনা

করতো। কবি গোলাম মোস্তফা তাঁর সুবিখ্যাত 'বিশ্বনবী' গ্রন্থে এমন একটি ছড়ার উল্লেখ করেছেন ঃ

বেঁচে থাকুক মুহম্মদ — সে দীর্ঘজীবী হোক,
চির-তরুণ চির-কিশোর চির-মধুর হোক।
হয় যেন সে সরদার আর পায় যেন সে মান,
শত্রু তাহার ধ্বংস হউক — ঘুচুক অকল্যাণ।
মুহম্মদের পানে খোদা করুণ চোখে চাও,
চিরস্থায়ী গৌরব যা — তাই তাহারে দাও।'

কী আশ্চর্য, বালিকা শায়েমার কল্যাণ কামনায় যেন বৃদ্ধ আবদুল মোত্তালিবের কথাই প্রতিধ্বনিত হলো।

দেখতে দেখতে দু'দুটি বছর অতিবাহিত হলো। শিশু মুহম্মদ পুষ্ট ও সুদর্শন অবয়ব ধারণ করলেন। অতঃপর তিনি ফিরে এলেন মা আমিনার কোলে। পুত্রকে কোলে পেয়ে আমিনার বুক জুড়িয়ে গেলো। কিন্তু না। মা ও সন্তানের মিলন এবারেও কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী হলো না। দেখতে দেখতে মক্কা নগরী ও তার আশেপাশে ছড়িয়ে পড়লো ভয়াবহ মহামারী। মা ও পিতামহ শিশুকে মক্কায় রাখা নিরাপদ মনে করলেন না। কাল বিলম্ব না করে তাঁরা শিশুকে আবার রেখে এলেন বিবি হালিমার ঘরে। কবি গোলাম মোস্তফার ভাষায় ঃ

> "দুই বৎসর পরে যদিওবা জননীর কোলে ফিরিয়া আসিলেন, তখনও মাতৃস্নেহ ভোগ করার মতো অবসর তাঁহার জুটিল না। জননীর স্নেহ, গৃহের মায়া, স্বদেশ ও স্বজাতির প্রেম — কোনো কিছুই তাঁহাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারিল না। বাহির হইতে কে যেন তাঁহাকে ডাকিল। ঘর তাঁহার পর হইল, পর তাঁহার আপন হইল। বেদুঈন পল্লীর সেই নিভৃত কুটিরে, আবার তিনি ফিরিয়া আসিলেন।"

৯

শিশু মুহম্মদ আবার ফিরে এলেন বিবি হালিমার ঘরে। এ যেন তাঁর জন্য শাপে বর হয়ে দেখা দিলো। এর মধ্য দিয়েই যেন শুরু হলো এই অবোধ

শিশুর বন্ধনমুক্তির পালা।

মক্কার সঙ্গে তায়েফের শুধু ভাষা ও সংস্কৃতিগত প্রভেদই নয়, ভূ-প্রকৃতি ও মানসিকতাগত প্রভেদও বিশেষভাবে লক্ষ্যযোগ্য। মক্কা হচ্ছে নগরী, মানুষের হাতে-গড়া দালানকোঠায় পরিপূর্ণ একটি সুসজ্জিত এলাকা। আর তায়েফের যে স্থানে বিবি হালিমার ঘর, সেই স্থানটি মরুভূমি, — ধু ধু বালি আর বালি, চারদিকে মুক্ত প্রকৃতির সীমাহীন বিস্তৃতি। তায়েফ যেন সুন্দরতম ভাষায় লিখিত বিশ্ব-ব্রহ্মান্ডরূপ বিশালতম প্রাকৃতিক পুথিরই একটি ক্ষুদ্র রূপ। তায়েফ যেন নিজেই শিক্ষক। তার উপর, তায়েফের বৈচিত্র্যময় মরুভূমির বৈশিষ্ট্যের তো অন্ত নেই। দিনের বেলায় রৌদ্রঝলসিত তায়েফের চিকচিকে বালিতে জীবনের সংগ্রামী উদ্দামতা, আর রাতে নেমে আসে হিম-প্রশান্তি-ভরা কাব্যের ঝঙ্কৃত গীতলতা। তায়েফের বুকে যেন প্রতি মুহূর্তে বেজে চলেছে সীমার মাঝে অসীমের বাঁশি। তায়েফ যেন প্রতি মুহূর্তেই সুদূরের পিয়াসী।

দু বছর বয়স থেকেই এই পরিবেশের সঙ্গে বেড়ে উঠতে লাগলেন শিশু মুহম্মদ। যে-বয়সে শিশুর ইন্দ্রিয় থাকে সবচেয়ে সজাগ ও গ্রহণশীল, যে বয়সে তার অবচেতন মনের চিত্রাবলী ভবিষ্যত জীবনের উৎস-চিত্র হয়ে থাকে, ঠিক সেই বয়সটাই তিনি অতিবাহিত করলেন তায়েফে। কবি গোলাম মোস্তফা বলেন ঃ

> "কী অদ্ভুতভাবেই না শিশু নবীর জীবন আরম্ভ হইল! -----
> খোদা যেন কোন গূঢ় উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই মুহম্মদকে বারে বারে ঘর হইতে টানিয়া বাহিরে আনিলেন। সমাজের বিকৃত চিন্তা ও কলূষিত আদর্শের ছাপ পড়িবার পূর্বেই তিনি তাহাকে সরাইয়া আনিয়া বিশাল মরুভূমির উন্মুক্ত পটভূমিতে স্থাপন করিলেন। তারপর প্রকৃতির বিরাট গ্রন্থ তাঁহার সম্মুখে খুলিয়া ধরিলেন, একে একে তাঁহাকে প্রাথমিক পাঠ দিতে আরম্ভ করিলেন। প্রভাতের করুণ রাঙা-আকাশ, মধ্যাহ্নের অগ্নিক্ষরা লু-ভরা বাতাস, নিস্তব্ধ নির্জন রাতের ধ্যান-গম্ভীর মৌনতা, দূরে দূরে গিরি উপত্যকার ধূসর

শ্রী, মরু–দিগন্তের মায়া–মরীচিকা, সমস্তই তাঁহার মনে এক অপূর্ব বিস্ময় ও জিজ্ঞাসার সৃষ্টি করিতে লাগিল।------সকল জ্ঞানের, সকল সত্যের, সকল তথ্যের উৎস যেখানে — সেখানে বসিয়াই তিনি জ্ঞানামৃত পান করিতে লাগিলেন।"

স্বাভাবিক ভাবে প্রশ্ন জাগে, এই শিক্ষাই কি একজন শিশুর জন্যে পর্যাপ্ত শিক্ষা? তাহলে বইপুস্তক আর স্কুল–কলেজের শিক্ষার কি কোনো প্রয়োজন নেই? — আছে, নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু হযরত মুহম্মদের (সঃ) ক্ষেত্রে বিষয়টি একটু অন্যরূপ। এ প্রসঙ্গে মওলানা আকরম খাঁর মতামত প্রণিধানযোগ্য ঃ

"আমাদিগের পাঠক–পাঠিকা হয়তো ভাবিতেছেন — ধাত্রীর আবাসে মাতার স্নেহপূর্ণ ক্রোড়ে এবং পিতামহ ও পিতৃব্যের যত্নে হযরতের জীবনের প্রথম যুগ অতিবাহিত হইতে চলিল, অথচ তাঁহার শিক্ষার কোন ব্যবস্থা করা হইতেছে না, ইহা বড়ই আশ্চর্যের কথা। কিন্তু বস্তুতঃ ইহাতে আশ্চর্যের কিছুই নাই। আরবদেশে বিশেষতঃ কোরেশদিগের মধ্যে, সেকালে সন্তানদিগকে লেখাপড়া শিখাইবার নিয়মই ছিল না। এমন কি, চল্লিশ বৎসর পরেও তাহাদের মধ্যে লেখাপড়া জানা লোকের সংখ্যা অঙ্গুলিতে গণনা করা যাইতে পারিত। ফলতঃ আমাদের হযরত সম্পূর্ণ নিরক্ষর ছিলেন।"

প্রসঙ্গত, হযরত নিরক্ষর থাকায় নবুয়ত প্রাপ্তির পর তাঁর জীবনে যে কৌশলগত সুবিধাটুকু অর্জিত হয়েছিলো, সেটিও এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। মওলানা আকরম খাঁর ভাষায় ঃ

"তিনি কোন পাঠশালায় গিয়া থাকিলে বা কোন গুরুর নিকট লেখাপড়া শিখিলে তাঁহার আত্মীয়স্বজন ও দেশস্থ লোকদিগের তাহা অবিদিত থাকিত না। তাহা হইলে এইসূত্রে তাঁহারা কোরআন অবিশ্বাস করিতেন এবং হযরতকে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রতিপন্ন করার চেষ্টা পাইতেন।"

কবি গোলাম মোস্তফার মতে ঃ

> "অসম্পূর্ণ মানুষের অসম্পূর্ণ শিক্ষা গ্রহণ করিলেই তিনি ছোট হইয়া যাইতেন। মানুষের দেওয়া জ্ঞান তাঁহার মনের উপর একটা পর্দার আড়াল টানিয়া দিত ; চিরজ্যোতির্ময়ের জ্যোতিঃপুঞ্জ তখন আর প্রত্যক্ষভাবে তাঁহার চিত্তে আসিয়া প্রতিফলিত হইতে পারিত না।"

সে যা-ই হোক। জ্ঞানার্জনের জন্যে হযরত মুহম্মদ (সঃ) সারা জীবনই মানুষকে উৎসাহিত করেছেন। তিনি বলেছেন, বিদ্যার্জন প্রতিটি মুসলমান নরনারীর অবশ্য-কর্তব্য। নিজের জীবনে তিনি যে নিরক্ষর ছিলেন, এ ছিল একটি ভিন্নতর অবস্থার পরিপ্রেক্ষিত মাত্র। জ্ঞানের দুটি ভাগ ঃ স্বজ্ঞা ও প্রজ্ঞা। স্বজ্ঞার দ্বারা যাঁরা চালিত হন, তাঁরা সাধারণ হয়েও অসাধারণ। তাঁরা মানব হয়েও মহামানব। হযরত ছিলেন তেমনি একজন অসাধারণ মানুষ। স্বজ্ঞাই ছিল তাঁর সকল জ্ঞানের উৎস। আর যাঁরা সাধারণ মানুষ, পুথিগত বিদ্যার সাহায্যেই তাঁরা প্রজ্ঞাবান হন, জ্ঞানী হন। এ কারণে, বিদ্যাশিক্ষা প্রতিটি সক্ষম মুসলমান নরনারীর উপর ফরজ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

১০

হযরত মুহম্মদ (সঃ) পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত হালিমার ঘরে অবস্থান করেছিলেন। এই পাঁছ বছর তাঁর জীবনে নানা কারণে বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। এই সময়ে তাঁর জীবনে যে সব ঘটনা ঘটেছে বলে শুনা যায়, সিনা-চাক বা বক্ষ-বিদারণ তার অন্যতম। এই বক্ষ-বিদারণের ঘটনার সত্যাসত্য সম্পর্কে পন্ডিত, আলেম ও ইতিহাসবিদদের মধ্যে আজো বিতর্কের অনসান হয় নি। কেউ বলেন, আল্লাহ্‌র নবীর জীবনে এমন ঘটনা ঘটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। কেউ বলেন, অল্লাহ্‌র নবী জন্মত নিষ্পাপ ; কাজেই তাঁর ক্ষেত্রে সিনা-চাকের কোনো প্রশ্নই উঠে না। কেউ বলেন, এমনটি হওয়া আদৌ সম্ভব নয়।

যা-ই হোক, 'ছহী মোসলেম' হাদিসে ঘটনাটির উল্লেখ আছে। হযরত

আনাস নামক একজন তরুণ সাহাবাই এই কাহিনীর উৎস ঃ

"একদা হযরত বালকদিগের সহিত খেলা করিতেছিলেন, এমন সময় জিব্রাইল ফেরেশ্‌তা তথায় উপস্থিত হইলেন। জিব্রাইল হযরতকে একটু আড়ালে লইয়া গিয়া তাঁহাকে চিৎ করিয়া শোয়াইলেন, তারপর তাঁহার বুক চিরিয়া হৃৎপিন্ড বাইরে আনিয়া তাহার মধ্য হইতে খানিকটা জমা-রক্ত বাহির করিয়া ফেলিলেন এবং বলিলেন, শয়তানের অংশ যে-টুকু তোমার মধ্যে ছিল তাহা এই। তারপর সেই হৃৎপিন্ডটিকে একটি সোনার তশতরীতে রাখিয়া জমজমের পবিত্র পানি দ্বারা ধৌত করিলেন ; অতঃপর সেটিকে জোড়া লাগাইয়া পুনরায় যথাস্থানে সংস্থাপন করিলেন। বালকেরা দৌড়াইয়া গিয়া হালিমাকে বলিল ঃ 'দেখ গিয়া, মুহম্মদ নিহত হইয়াছে' তখন সকলে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, মুহম্মদ বিবর্ণ হইয়া পড়িয়া আছেন। আনাস বলিতেছেন ঃ আমি হযরতের বুকে দাগ দেখিয়াছি।"

সাধারণ দৃষ্টিতে এটি একটি অস্বাভাবিক ঘটনা। হযরতের জীবনে যে সব অতিলৌকিক ঘটনার কথা উল্লেখিত আছে, এটিও তেমন একটি ঘটনা বলেই মনে হয়। তবে এ ঘটনার উৎস মূলত আনাস হলেও ইবনে হিশামসহ অনেকেই এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। অনেক ঐতিহাসিকও ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেছেন। তবে কেউ কেউ ঘটনাটি সম্পর্কে ভিন্নতর ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই ঘটনা সম্বন্ধে বিভিন্ন আলেম ও তফসীরকারদের মধে বহু মতপ্রভেদ বিদ্যমান। পরিশেষে টীকাকারগণ বলতে বাধ্য হয়েছেন যে, হযরতের বক্ষ-বিদারণের ঘটনা কয়েকবার সংঘটিত হয়। যথা ঃ (১) একবার হালিমার নিকট অবস্থানকালে, (২) একবার তাঁহার দশ বছর বয়সকালে, (৩) একবার হেরা-পর্বতে জিব্রাইলের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাত ও কথোপকথনের সময় এবং (৪) একবার মেরাজের রাত্রে।

আমরা ঘটনার চেয়ে ঘটনার তাৎপর্য সম্পর্কে অধিক উৎসাহী। এই ঘটনার তাৎপর্য এই যে, হযরতের শরীরে ও মনে মানব-সুলভ যে

কুপ্রবৃত্তি ছিল, তা বের করে ফেলে হযরতকে শুদ্ধ মানুষে পরিণত করা হলো। আসলে হযরত মুহম্মদ (সঃ) যে একজন মানুষ, এই ঘটনার ফলে সেই সত্য আরো স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়।

কুরআন শরীফে স্পষ্টাক্ষরে বলা হয়েছে, "(মুহম্মদ) তুমি সকলকে বলিয়া দাও যে, নিশ্চয়ই আমি তোমাদের ন্যায় একজন মানব বই আর কিছুই নই।" হযরত মুহম্মদ (সঃ) নিজেও বার বার বলেছেন, "আমি একজন মানুষ বই আর কিছুই নই।"

তবে হযরতের সঙ্গে আর দশজনের যে মৌলিক পার্থক্য, সেটি হলো এই যে, হযরত ছিলেন একাধারে মানুষ ও আল্লাহ্র প্রেরিত পুরুষ। তাই আল্লাহ্র ইচ্ছানুসারেই তাঁর হৃদয় ও দেহকে কলুষমুক্ত করে তাঁকে আদর্শ মানুষ বা সম্পূর্ণ মানবে পরিণত করা হলো। বক্ষ-বিদারণের ঘটনাটি, একারণেই, প্রতীকী তাৎপর্যময়তায় সমৃদ্ধ। আবার বলা যায়, এ ধরনের ঘটনা ঘটা যে অত্যন্ত স্বাভাবিক, আজকের বিজ্ঞানের অগ্রগতি আজ আমাদের সম্মুখে তা স্পষ্ট করে প্রমাণ করেছে। অর্থাৎ চৌদ্দশ বছর পূর্বে এটি একটি অলৌকিক ঘটনা বলে মনে হলেও আজ বিংশ শতাব্দীর মানুষের কাছে হৃদপিন্ড অস্ত্রোপচার করার ব্যাপারটি কোনো নতুন বা অভিনব সংবাদ নয়। বর্ণিত ঘটনায় স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে যে, সে যুগের কোনো মানুষ নয়, স্বয়ং জিব্রাইল (আঃ) এই অস্ত্রোপচার সম্পন্ন করেছেন। বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানীর হাতে যে কাজ সম্ভব, মাত্র চৌদ্দশ বছর আগে আল্লাহ্র ফেরেশতার পক্ষে সে কাজ অসম্ভব হওয়ার কোন কারণই নেই। কবি গোলাম মোস্তফা যথার্থই মন্তব্য করেছেন, "রসুলুল্লাহ্র মারফত চৌদ্দশত বৎসর পূর্বে জগদ্বাসী এই অভিনব চিকিৎসা-পদ্ধতির সন্ধান পায় নাই কি? ঘটনাটির ব্যাখ্যা যেরূপই হউক, নূতন আইডিয়া হিসাবে ইহার মূল্য আছে।"

১১

হযরতের বয়স তখন পাঁচ। দুধ-মা হালিমার কোল থেকে তিনি ফিরে এলেন মা আমিনার কোলে। দুধ-মা হালিমা ও দুধ-বোন শায়েমার সঙ্গে সেই

থেকেই তাঁর বাহ্যিক সম্পর্ক শেষ হয়ে গেলো। কিন্তু হযরত কখনও বিস্মৃত হন নি হালিমার কথা, দুধ–বোন শায়েমার কথা কিংবা তাঁর অপরাপর দুধ–ভাই ও বোনের কথা। চিরদিন হযরতের কাছে বিবি হালিমা ছিলেন মায়ের আসনে আসীনা। বিয়ের সময় থেকে শুরু করে চরম দুর্ভিক্ষের দিনেও হযরত দুধ–মা ও দুধ–ভাইবোনদের খোঁজ–খবর রাখতেন, সাধ্যমতো তাঁদের সাহায্য করতেন। বিবি হালিমাকে দেখা মাত্রই হযরত সসম্মানে দাঁড়িয়ে পড়তেন, নিজের শিরস্ত্রাণ হালিমার আসন হিসেবে বিছিয়ে দিয়ে বলে উঠতেন, 'মা, আমার মা'

পাঁচ বছর বয়সে হযরত মায়ের কোলে ফিরে এলেন বটে, কিন্তু বেশীদিন থাকার সুযোগ পেলেন না। ছেলেকে বুকে পেয়ে মা যেমন আনন্দিত, পৌত্রের সান্নিধ্যে বৃদ্ধ পিতামহও তেমনি উল্লসিত। জীবন যেন দুজনের কাছে নতুনভাবে অর্থময় হয়ে উঠলো।

কিন্তু কোথা থেকে যেন কী হয়ে গেল।

হঠাৎ আমিনার হৃদয়ে এক অদ্ভুত ভাবের উদয় হলো। শিশু জন্মের পর থেকেই মা হিসেবে বিবি আমিনা একটা জিনিস বিশেষভাবে আঁচ করতে পেরেছিলেন। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন, বালক মুহম্মদ মাঝে মাঝেই যেন নিজের ভিতর হারিয়ে যেতে থাকে। তখন তাঁর সারা শরীরে ফুটে ওঠে এক অপরূপ দিব্যালোক। আমিনার মনে পড়লো, সেই পুরনো স্বপ্নের কথা। তিনি নিশ্চিত হলেন যে, কালে তাঁর ছেলে একজন অসাধারণ মানুষে পরিণত হবে।

ভেবেই আনমনা হয়ে গেলেন বিবি আমিনা। হায় আজ যদি শিশুর পিতা জীবিত থাকতেন! দীর্ঘশ্বাস বের হয়ে এল তাঁর বুক চিরে। আর তখন তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন মদিনা যাবার। মক্কা থেকে মদিনার দূরত্ব প্রায় দুইশ পঞ্চাশ মাইল। কিন্তু এই দূরত্ব আমিনার ব্যাকুল হৃদয়ের কাছে কোন দূরত্বই মনে হলো না। মদিনায় আছে শিশুর পিতার কবর আর আমিনার নিজের পিতৃকূল।

বৃদ্ধ পিতামহ আবদুল মোত্তালিব বিবি আমেনার ইচ্ছায় বাধ সাধলেন না। পুত্রের কথা মনে হতেই তাঁর দুচোখ বেয়ে অঝোর ধারায় অশ্রু নেমে এলো।

যাক। শিশু মুহম্মদ তাঁর পিতা আবদুল্লাহ্‌র কবর জিয়ারত করে আসুক। গর্বে ও আনন্দে বৃদ্ধের বুক যেন ফুলে উঠলো। দুই হাতে মুখ মুছে তিনি মা ও ছেলের উদ্দেশ্যে আশীর্বাদের কণ্ঠে বললেন, 'আলবিদা'

উম্মে আইমান নামক একজন পরিচারিকা নিয়ে শুরু হল মা ও ছেলের দুঃসাহসিক যাত্রা। মদিনা পৌঁছেই বিবি আমিনা ছেলেসহ অশ্রুসিক্ত নয়নে স্বামীর কবর জিয়ারত করলেন। শিশু মুহম্মদ মায়ের ভেঙে–পড়া অবস্থা দেখে কেমন যেন বিমূঢ় হয়ে গেলেন। সর্বহারার এক সর্বগ্রাসী বেদনা যেন তাঁর কোমল মনকেও স্পর্শ করে গেলো।

প্রায় মাসাধিক কাল মদিনায় পিতৃগৃহে অবস্থান করলেন বিবি আমিনা। তারপর তিনি ছেলে ও পরিচারিকাসহ আবার মক্‌কার উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন। তখন তাঁর দেহেমনে এক ধরনের অন্তহীন অবসাধ। ক্লান্তিতে পা যেন আর চলে না। এমনি সময়ে মক্‌কা ও মদিনার মধ্যবর্তী এক স্থানে অকস্মাৎ তিনি আক্রান্ত হলেন কালব্যাধিতে। বড় সাংঘাতিক সেই ব্যাধি। মাত্র কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি ঢলে পড়লেন মৃত্যুর হিমশীতল কোলে। ধরার ধুলায় আরব্ধ কর্তব্য সমাপন করে বিবি আমিনা মহাকালের যাত্রী হলেন।

উম্মে আইমান কোনোমতে বিবি আমিনাকে কবর দিয়ে মক্‌কার উদ্দেশ্যে পাড়ি দিলো। শিশু মুহম্মদের কাছে সব কিছু কেমন যেন হেঁয়ালি বলে মনে হলো। মায়ের বিদায়ের দৃশ্য তাঁর চোখে এক রহস্যময় জগতের দ্বারোদ্‌ঘাটন করলো।

তার মাত্র দুবছর পর মারা গেলেন বৃদ্ধ পিতামহ আবদুল মোত্তালিব। সাত বছরের বালক মুহম্মদ দেখলেন, "একে একে সকল বন্ধন কাটিয়া গেল। ---মনের চারিপাশে তাঁহার আর কোনো বন্ধন নাই। বিশ্বের বুকে এখন তিনি একা। নিঃসঙ্গ অবস্থায় এবার তিনি পথে বাহির হইলেন। অসহায় বালক, সম্মুখে দুর্গম গিরিকান্তার, সহায় নাই, সঙ্গী নাই, পথ নাই, পাথেয় নাই। তবু তিনি বুঝিলেন, এই দুস্তর প্রান্তর একাই তাঁহাকে পাড়ি দিতে হইবে।"

১২

একদিকে এই মহাপৃথিবী, অন্যদিকে এক অবোধ শিশু।
একদিকে সৃষ্টির অপার-রহস্য, অন্যদিকে বিস্মিত দুটি চোখ।
শিশু-মুহম্মদ চোখ তুলে তাকালেন মহাসৃষ্টির দিকে।
মরুভূমির অগণন বালুকারাশির উপর বিম্বিত ঝাঝা রোদ্দুর,
রাতের স্বচ্ছ আকাশে কোটি কোটি নক্ষত্রের আলোক-মেলা, ধূ ধূ প্রান্তরে
নিঃসঙ্গ মরুচারী পথিক আর দিগন্তলীন উটের কাফেলা,
তীর্থভূমি মক্কায় কত শত মানুষের আনাগোনা,
তাদের বিচিত্র কথাবার্তা, চালচলন, জীবনাচরণ —
এমনি আরো কতো কি, এমনি আরো কত কিছু
শিশু মুহম্মদের মানসলোকে প্রবলভাবে ছায়াপাত
করে গেলো। তিনি বুঝলেন,
এই সৃষ্টির শেষ নেই, এই জীবনের শেষ নেই ;
একটি নিগূঢ় সম্পর্কের সূত্রে এই বিশ্বপ্রকৃতির সব কিছুই যেন গভীরভাবে আবদধ।
শিশু মুহম্মদ, একাকী ও এতিম মুহম্মদ
হঠাৎ করেই যেন একের ভিতর বহুর অস্তিত্বের সন্ধান পেলেন।
বহির্জগতের সঙ্গে, জীবনের অচিনলোকের সঙ্গে
পরিচিত হওয়ার জন্যে তাঁর অন্তর ব্যাকুল হয়ে উঠলো।

১৩

শৈশব যায়-যায়। কৈশোর আগত প্রায়।
মুহম্মদ সবেমাত্র বারো বছরের নওল কিশোর।
পিতৃব্য আবু তালিব তখন তাঁর অভিভাবক।
পিতৃমাতৃহীন এই কিশোর আবু তালিবের বড়ই প্রিয়পাত্র।
আবু তালিব বাণিজ্যযাত্রার আয়োজন করছিলেন।
সিরিয়ার উদ্দেশ্যেই তাঁর এ বাণিজ্যযাত্রা।

উটের পিঠে বোঝাই হচ্ছে হরেক রকম মালামাল।
চারদিকে লোকজনের সশব্যস্ত আনাগোনা।
বালক মুহম্মদ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব কিছু দেখছিলেন।
এতো সব ব্যস্ততা, অজানার পথে এই যাত্রা।
এতো সব আয়োজন তাঁর মনকে
কেমন যেন উন্মনা করে তুললো।
সুদূরের তৃষ্ণায় ভরে উঠলো তাঁর চঞ্চল হৃদয়।
হঠাৎ তাঁর মনে হলো, মরুভূমির চির-স্বচ্ছ চির-উদার চির-মুক্ত আকাশে
লাটাই-ছেড়া ঘুড়ির মতো তিনি যেন উড়ে বেড়াতে লাগলেন।
এক অজানা শিহরণে থরথর করে কেঁপে উঠলো
তাঁর শরীর, কাঁপা কাঁপা ঠোঁটে প্রায় অস্পষ্ট স্বরে
তিনি উচ্চারণ করলেন, 'যাবো, আমিও যাবো।'
তিনি যে আজ চির-নতুনের ডাক শুনেছেন।
অদূরে দাঁড়িয়ে পিতৃব্য আবু তালিব সব কিছু লক্ষ্য করছিলেন।
মুহম্মদের ভাবুকতা তাঁর পরিবারের কারুরই অবিদিত ছিল না।
উদার ও স্নেহপ্রবণ আবু তালিব মুহম্মদের ইচ্ছায় বাধ সাধলেন না।
দিগন্তলীন বালুকারাশির মধ্যে অস্পষ্ট চলমান বিন্দুর মতো এগিয়ে চলেছে উটের কাফেলা। সেই কাফেলায় আছে আবু তালিব ও তাঁর সঙ্গীসাথী। তাঁদেরই মাঝখানে বসে আছে এক বিস্মিত বালক। বালক বাণিজ্যের কীই-বা বোঝে? কীই-বা বোঝে সিরিয়ার?
মুগ্ধ বালকের চোখ শুধু দেখে ঃ ওইতো শুরু হলো যাত্রা।

১৪

কথিত আছে, সেকালে সিরিয়ার বসরা নগরীতে বাহিরা রাহেব নামক একজন খৃস্টান পাদ্রী ছিলেন।
তিনি ছিলেন অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ ও একেশ্বরবাদী।
আবু তালিবের বাণিজ্য-বহর তাঁর গির্জার কাছে এসে তাঁবু গাড়লো।
কোরেশদেরকে গির্জার কাছে আসতে দেখেই বাহিরা তাঁর গির্জা থেকে

বেরিয়ে এলেন। অত্যন্ত সতর্ক চোখে তিনি প্রত্যেকটি বিদেশীকেই পরখ করে দেখতে লাগলেন। অবশেষে তাঁর উৎসুক চোখে ফুটে উঠলো আলোর রেখা। মনে হলো, তিনি যেন মুহূর্তেই সব পেয়েছি–র দেশে পৌঁছে গেলেন।

বালক মুহম্মদকে বুকে জড়িয়ে ধরে অনেকক্ষণ তিনি নিশ্চুপ হয়ে থাকলেন। তিনি যেন মুহম্মদের হৃৎপিন্ডের শব্দ পড়ার চেষ্টা করছিলেন। হযরতের চেহারা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখার পর তিনি বিড় বিড় করে কী যেন স্মরণ করলেন। আসলে তিনি মনে মনে বাইবেলের বিশেষ কিছু চরণ আবৃত্তি করে নিলেন। তারপর হঠাৎ বলে উঠলেন, 'এই তো সেই প্রতিশ্রুত নবী। এই তো তাঁর শরীরে সেই প্রতিশ্রুত মোহরে নবুয়ত।'

বাহিরার মুখ থেকে আবু তালিব ও অন্যান্য কোরেশরা শুনলেন, এই বালক মুহম্মদই বাইবেল, যবুর, ও তওরাতে বর্ণিত জগতের সর্বশেষ প্রতিশ্রুত নবী।

অতঃপর বাহিরার প্রসন্নমুখ সহসা বিষাদে পূর্ণ হয়ে উঠলো। কোরেশদের উদ্দেশ্যে তিনি বললেন, 'কিন্তু সাবধান। অচিরেই ইহুদীরা এই নবীর আবির্ভাব সম্পর্কে সচেতন হবে। তখন তারা তাঁকে হত্যা করতে সচেষ্ট হবে।'

বাহিরার পরামর্শে আবু তালিব তড়িঘড়ি করে সে যাত্রা সিরিয়া থেকে ফিরে এলেন। আবু তালিব ও সঙ্গীয় কোরেশগণ স্পষ্ট বুঝতে পারলেন, মুহম্মদ তাঁদের কাছে স্রষ্টার এক পবিত্র আমানত।

সেবার বাণিজ্যে তাদের প্রচুর মুনাফা হলো।

১৫

সিরিয়া–যাত্রায় হযরতের ব্যক্তিগত লাভ হলো প্রধানত দুটি।

এক, তিনি প্রাচীন সমুদ জাতির কাহিনী শুনলেন।

দুই, তিনি বসরার স্নিগ্ধ শ্যামকান্তি প্রকৃতির রূপ দর্শন করলেন।

সিরিয়ার পথেই হেজাজ। অদূরে নির্জন, রহস্যময় এক মরুপ্রান্তর।

এখানেই বাস করতো সুপ্রাচীন সমুদ জাতি।

হযরত ইব্রাহীমের (আঃ) অনেক আগে ছিল তাদের বাস।
তারা আল্লায় বিশ্বাস করতো না,
ঐশ্বরিক বিধান মানতো না।
তারা সবাই মূর্তিপূজা করতো।
তাদেরকে সৎপথে আনার জন্যে তাদের মাঝে প্রেরিত হলেন এক নবী।

নাম তাঁর সালেহ্ পয়গম্বর।
নবীর উপদেশে তারা কর্ণপাত করলো না।
কিন্তু নবীর অলৌকিক মোজেজা দেখে তারা তাঁর অনুসারী হলো।
হযরত সালেহ (আঃ) তাদেরকে পরীক্ষা করার জন্যে তাদের কাছে একটি উট আল্লাহ্‌র পবিত্র আমানত হিসেবে রেখে অন্যত্র চলে গেলেন। যাওয়ার সময় বারবার সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বললেন,
'তোমরা আল্লাহ্‌র পথ থেকে বিচ্যুত হয়ো না। আল্লাহ্‌র পবিত্র আমানত খেয়ানত করো না। এই উটটিকে কখনো হত্যা করো না।'
হযরত সালেহ্ চলে গেলেন। কিছুদিনের মধ্যে তাঁর অনুসারীরা তাঁর উপদেশ বিস্মৃত হলো। তারা আল্লাহ্‌র পথ থেকে সরে এলো। এমনকি উটটিকেও হত্যা করলো।
আর সমগ্র সমুদ জাতি হাতে হাতেই পেলো তার নির্মম প্রতিদান। একদিন ঘোর বজ্রঝড় ও ভূমিকম্পে সমুদ জাতির উপর যেন নেমে এলো রোজ কিয়ামত। এতদিনকার ফুলে-ফলে বিকশিত একটি সমৃদ্ধ দেশ নিমেষেই জনমানবশূন্য একটি মরুভূমিতে পরিণত হলো।
বালক মুহম্মদের চোখ আরও তৃষ্ণার্ত হয়ে উঠলো। তাঁর চোখ যেন বার বার খুঁজে ফিরছে একটি সমৃদ্ধ জাতিকে, ধূ ধূ বালিকারাশির আড়ালে হারিয়ে-যাওয়া একটি বিকশিত প্রকৃতিকে, ধ্বংসের আড়ালে লুকিয়ে-থাকা সৃষ্টির অন্তহীন প্রাচুর্যকে।
কাফেলা বসরা নগরীতে এসে পৌছলো।
কী অপূর্ব সুন্দর এই নগরী।
এমন পাখি-ডাকা ছায়া-ঢাকা স্নিগ্ধশীতল কুঞ্জবন, এমন বর্ণিল গোলাপ বাগান, এমন শান্তস্নিগ্ধ নদীর জল, মানুষের মুখে মুখে এমন প্রাণোচ্ছল

বৈভব — এসব যেন মুহম্মদের চিত্তপটে পুনরায় জাগ্রত করলো সমুদ জাতির প্রাচুর্যময় অতীত কাহিনী।

ধ্বংস ও সৃষ্টির এই বৈপরীত্যে বালক মুহম্মদের ভাবলোকে নতুনভাবে দোলা লাগলো। জীবনের সকল ক্রিয়াকান্ডের অন্তরালে তিনি যেন আর একটি অবশ্যম্ভাবী অদৃশ্য শক্তির নিঃশব্দ পদচারণা প্রত্যক্ষ করতে লাগলেন।

১৬

সিরিয়ার পর পিতৃব্য আবু তালিবের সঙ্গে মুহম্মদ আরো কিছু বাণিজ্য-যাত্রায় অংশ নিলেন। ক্রমে ক্রমে জীবনের রূঢ় বাস্তবতা তাঁকে প্রতিনিয়ত নতুন নতুন উপলব্ধির মুখোমুখি দাঁড় করাতে লাগলো।

এই সময়েই শুরু হলে তাঁর জীবনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। অবসর মুহূর্তে হযরত তাঁর পিতৃব্যের সুবিশাল মেষপাল নিয়ে মরুভূমিতে যেতেন। বিবি হালিমার গৃহে থাকতে অবোধ বালকের হৃদয়ে মরুভূমির যে উদ্দাম ও দিগন্তলীন প্রাকৃতিক বিস্তৃতি একটি চিত্র হয়ে গেঁথে গিয়েছিলো, কিশোর মুহম্মদের জ্ঞানোন্মুখ হৃদয়ে তা যেন একটি জীবন্ত পুস্তক হয়ে উন্মোচিত হতে থাকলো। মেষপালকের বৃত্তি তাঁর জন্যে বয়ে আনলো আরো একটি বাড়তি সুসংবাদ। নিজের অজান্তেই তিনি একপাল অবোধ-অবুঝ প্রাণীর উপর কর্তৃত্ব করতে শিখলেন, তাদের সুখ-দুঃখের ভাগী হতে শিখলেন, তাদেরকে পরিচালিত করার শক্তি অর্জন করলেন। তাঁর হৃদয়ে একাধারে প্রকৃতিপ্রেম ও জীবপ্রেম সমন্বিত হওয়ার সুযোগ পেলো।

কেউ কেউ উল্লেখ করেছেন, মেষপালক হওয়া, মেষের রাখাল হওয়া — নবী ও রসুলদের জীবনের একটি পরিচিত ঘটনা। এর মাধ্যমেই তাঁদের মধ্যে বিকশিত হয় প্রাথমিক সাংগঠনিক শক্তি।

কিন্তু জ্ঞান-স্ফুরণের এই গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণে হযরতের জীবনে মেষপালক হওয়ার তাৎপর্য আরো সুদূরপ্রসারী। মেষপালক হওয়াকে উপলক্ষ্য করেই তিনি যেন সম্পূর্ণভাবে নিজের ভিতর নিমগ্ন হওয়ার সুযোগ পেলেন। চারপাশে উষর মরুর বুকে ছড়ানো-ছিটানো জীবিকান্বেষী মেষের পাল,

উর্ধ্বে সীমাহীন নীলাকাশ, আর এই অনন্ত নিঃশব্দতার মধ্যে নিজের ভিতর বিশ্বকে খুঁজে ফিরছেন এক বালক-ধ্যানী ; জীবিকান্বেষী মেষ ও মানুষের মঙ্গল চিন্তায় ক্রমে ক্রমে দীর্ঘ ও প্রসারিত হচ্ছে তাঁর চিত্ত। মানবতার বৃহত্তর কল্যাণে তিনি নিজের ভেতরকার প্রকৃত ও পূর্ণাঙ্গ মানুষটিকে আবিষ্কারের চেষ্টায় ব্যাপৃত। ক্রমে ক্রমে বালকের উপলব্ধি হলো, নিরীহ মেষ ও অন্ধ কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষে মূলত কোনো প্রভেদ নেই।

১৭

কুসংস্কার আর কুসংস্কার।

আরবের সর্বত্র তখন শুধু কুসংস্কারের রাজত্ব।

পবিত্র কাবাগৃহে শোভা পাচ্ছে ৩৬০টি মূর্তি।

মানুষ আল্লাহ্‌র কথা ভুলে মূর্তিপূজায় লিপ্ত।

সামান্য কারণেই দাউ দাউ জ্বলে উঠছে যুদ্ধের বিভীষিকা।

মানুষের হৃদয় থেকে যেন লোপ পেয়ে গেছে দয়ামায়া।

মানুষের মধ্যকার মানবিক বন্ধন যেন ছিন্ন হয়ে গেছে।

সে-সময়ে আরবে নানা ধরনের মেলা বসতো। এতে জড়ো হতো বিভিন্ন গোত্রের লোকজন। তারা কবিতার সুরে সুরে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রতিদ্বন্দ্বী গোত্রের কুৎসা রটনা করতো। 'ওকাজ' মেলা ছিল এই ধরনের সবচেয়ে বড় মেলা।

একবার এই 'ওকাজ' মেলায় বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা তীব্র থেকে তীব্রতর হলো। অতঃপর তা ধারণ করলো মারাত্মক হানাহানির রূপ। একটানা পাঁচ বছর রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ চলতে লাগলো। এমনকি, কোরেশরাও এই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে বাধ্য হলো।

পিতৃব্য আবু তালিবের সঙ্গে হযরত মুহম্মদ (সঃ) শেষে শেষে যুদ্ধে যেতেন। তাঁর দায়িত্ব ছিল পিতৃব্য ও অন্যান্য সহ-যোদ্ধার তীর কুড়িয়ে আনা।

হযরত এই যুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করেন নি। তাই তিনি অত্যন্ত

কাছ থেকে যুদ্ধের বিভীষিকা উপলব্ধি করার সুযোগ পেলেন। তাঁর সম্মুখে উন্মোচিত হলো জীবনের আর একটি কঠোর বাস্তবতা। যুদ্ধের অভিশাপ তিনি দেখতে পেলেন স্বচক্ষে। এই অন্যায় যুদ্ধে অসংখ্য লোক আত্মাহুতি দিলো। বিধবা হলো অসংখ্য নারী, পিতৃহীন হলো অসংখ্য শিশু, নির্বংশ হলো অনেক পরিবার।

যুদ্ধ-শেষে, হযরত যুদ্ধের বিভীষিকা সম্পর্কে মানুষকে বুঝাতে লাগলেন। আর্তের কথা ভেবে তাঁর হৃদয় তখন অত্যন্ত ব্যাকুল। তিনি মানুষকে বুঝাতে চেষ্টা করলেন, যুদ্ধ নয়, শান্তিই মানুষের পরম প্রার্থিত ধন। জীবনের সুখ, সমৃদ্ধি আর যাবতীয় স্বাচ্ছন্দ্যের প্রথম শর্তই হলো শান্তি। এই প্রচারকার্যে তিনি তাঁর কনিষ্ঠ পিতৃব্য হযরত জুবায়েরকে সঙ্গী হিসেবে পেলেন।

হযরতের প্রচার-কার্যে অচিরেই সুফল দেখা দিলো। তখন তিনি তাঁর কাজকে আরো সংহত করার জন্য কতিপয় উৎসাহী তরুণকে নিয়ে গঠন করলেন ঃ হিলফ-উল-ফযুল বা শান্তিসঙ্ঘ। এই সঙ্ঘের উদ্দেশ্য ছিল পাঁচটি ঃ

১ নিঃস্ব, আর্ত, পীড়িত ও দুর্গতদের সেবা করা।
২ অত্যাচারীকে যথাসাধ্য বাধা দেওয়া।
৩ অত্যাচারিতকে সাহায্য করা।
৪ দেশের শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করা।
৫ বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে সৌহার্দ্য ও ভ্রাতৃত্ব বজায় রাখার চেষ্টা করা।

হযরতের জীবনে এই শান্তিসঙ্ঘের একটি সুদূরপ্রসারী ভূমিকা আছে। এই শান্তিসংঘের মাধ্যমেই তিনি সত্যপ্রচারের প্রথম দীক্ষা নিলেন। অচিরেই জনসাধারণের কাছে হযরতের জনদরদী ভূমিকা স্পষ্ট হয়ে উঠলো।
যেখানে দুঃখ-দুর্দশা আর বিপদ-আপদ, সেখানেই তিনি ;
সেখানেই শান্তিসঙ্ঘের কোন সদস্য গিয়ে উপস্থিত।
বিধবার পর্ণ কুটিরে, পীড়িতের রোগশয্যায়।
ক্ষুধিতের অন্নহীন ঘরে — সর্বত্রই তিনি

সাহায্যের হাত প্রসারিত করলেন।
সেবা, ত্যাগ ও মানবপ্রেমের এমন নিদর্শন খুব একটা দেখা যায় না।
যতই দিন যেতে লাগলো, হযরতের চারিত্রিক সৌন্দর্যে ততই আরববাসী মোহিত হয়ে পড়লো। ক্রমে ক্রমে তিনি প্রত্যেকেরই আস্থা অর্জন করলেন। সবাই তাঁকে যে-কোন কাজে একবাক্যে বিশ্বাস করতে শুরু করলো। তরুণ মুহম্মদ অচিরেই হয়ে উঠলেন 'আল-আমিন' বা 'বিশ্বাসী মুহম্মদ'।
ঘটনাচক্রে তাঁর 'আল-আমিন' নাম এত বেশি বিখ্যাত হয়ে উঠলো যে, এই নামের আড়ালে আসল নাম যেন ঢাকাই পড়ে গেলো। আসলে তরুণ মুহম্মদ ছিলেন তারুণ্যের একটি সর্বাঙ্গ-সুন্দর আদর্শ। সত্যবাদিতা, শৃঙ্খলা আর মানুষের প্রতি ভালবাসা তাঁর এই আদর্শের ভিত্তিভূমি। হযরত জীবনে কোনোদিন এই হিলফ-উল -ফযূলের আদর্শ থেকে বিচ্যুত হন নি।

১৮

এই তরুণ বয়সেই হযরতের বিচার-শক্তি সম্যকরূপে বিকাশ লাভ করেছিলো। পবিত্র কাবা-গৃহ পুনর্নির্মাণের সময় তার প্রমাণ পাওয়া গেলো। তখন কাবা-গৃহের কোন ছাদ ছিল না। কাবার চারপাশের দেয়ালগুলিও নেই বললেই চলে। বর্ষাকালে কাবার মেঝে বর্ষার পানিতে ভেসে যেত।
কোরেশরাই কাবার রক্ষক ও তত্ত্বাবধায়ক। তারা কাবাগৃহের সংস্কারসাধনে মনোযোগী হলো। এসময় জেদ্দার উপকূলে একটি পুরনো গ্রীক জাহাজের ধ্বংসাবশেষ বিক্রি হচ্ছিলো। কোরেশগণ বেশ সস্তায় জাহাজের তক্তাগুলো কিনে এনে কাবাগৃহ সংস্কারের কাজে হাত দিলো। সব কাজ ভালোয় ভালোয় সম্পন্ন হলো।
কেবল গোল বাধলো এক জায়গায়। 'হাজরে-আসওয়াদ' বা কৃষ্ণ পাথর কে স্থাপন করবে কাবা-গৃহে। কোরেশ বংশের প্রায় প্রত্যেক দলনেতাই এই দায়িত্ব পালনে আগ্রহী। কেউ কারো উপর এই মহান দায়িত্ব ছেড়ে দিতে

রাজী নয়। বহু চেষ্টা-তদবীর সত্ত্বেও কোনো মীমাংসায় উপনীত হওয়া গেলো না। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে একটি রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ শুরু হওয়ার উপক্রম হলো। অবশেষে কোরেশ-প্রধানগণ একটি সমঝোতায় এসে পৌছলেন। ঠিক হলো, কাল অতি প্রত্যূষে যিনি সর্বপ্রথম কাবাগৃহে প্রবেশ করবেন, তাঁকেই এই সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব দেওয়া হবে। পরবর্তী প্রভাতে কোরেশগণ দেখলো, অতি প্রত্যূষে তাঁদের প্রিয় আল-আমিনই সর্বপ্রথম কাবাগৃহে প্রবেশ করছেন। তরুণ আল-আমিনের উপর বিচার-ভার দেওয়া হলো। তিনি সবকিছু শোনার পর একটি চাদরের উপর পাথরটি নিজে এনে রাখলেন। কোরেশ-প্রধানদের বললেন, 'আপনারা প্রত্যেকে চাদরের খুট ধরে পাথরটি কাবাঘরের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে এনে রাখুন।' চাদরসহ পাথরটি দক্ষিণ-পূর্ব কোণে আনা হলো। হযরত নিজ হাতে পাথরখানা উঠিয়ে যথাস্থানে স্থাপন করলেন।

হযরতের প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের কারণেই এভাবে একটি রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ বন্ধ হলো।

১৯

দেখতে দেখতে মুহম্মদ একজন পরিপূর্ণ যুবকরূপে বিকশিত হয়ে উঠলেন।

তাঁর বয়স এখন পঁচিশ।

চারদিকে তাঁর সুখ্যাতি আর সুখ্যাতি।

এই তরুণ বয়সেই তিনি সারা দেশবাসীর আদরের পাত্র।

ঠিক এমনি সময়ে হযরতের বিয়ের প্রস্তাব এলো।

সে এক অদ্ভুত প্রস্তাব।

পাত্রীর নাম বিবি খোদেজা।

বয়স চল্লিশ।

মহিলা বিধবা।

কিন্তু চারিত্রিক শুচিতার জন্য মক্কাবাসীর কাছে এই মহিলা তাহিরা বা পবিত্র রমণী হিসেবে বিখ্যাত। উপরন্তু বিবি খদিজা বিপুল ধনসম্পত্তির মালিক। তাঁর ছিল সুবিশাল বাণিজ্য-বহর।

একদিকে 'আল-আমিন',
অন্যদিকে 'তাহিরা'।
একদিকে এক বিশ্বাসী তরুণ,
অন্যদিকে এক পবিত্র রমণী।

বিয়ের ব্যাপারে বিবি খাদিজাই বেশী উৎসাহী ছিলেন। বিয়ের আগে বিবি খাদিজা মুহম্মদকে তাঁর বাণিজ্য-বহরের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করেছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল, মুহম্মদের নিষ্ঠা, সততা, কর্মক্ষমতা ইত্যাকার গুণাবলী নিজের চোখে যাচাই করে দেখা। বিবি খাদিজার সেই গোপন পরীক্ষায় হযরত পাশ করে গেলেন।

বিবি খাদিজার উৎসাহে যথাসময়ে বিয়ের পয়গাম এলো। উভয় পক্ষের অভিভাবকদের সম্মতিতে শুভদিনে শুভকাজ সুসম্পন্ন হলো। হযরতের পক্ষে অভিভাবক ছিলেন তাঁর চাচা আবু তালিব আর খাদিজার পক্ষে তাঁর চাচা আমর-বিন আসাদ। এই বিয়েতে পণ ছিল মাত্র 'বারো উকিয়া'।

২০

হযরতের সঙ্গে বিবি খাদিজার দাম্পত্য-জীবন শুরু হলো। এই দাম্পত্য-জীবন জগতের একটি আদর্শ দাম্পত্য-জীবন। দীর্ঘ পঁচিশ বছর এই দম্পতি একসঙ্গে ঘরকন্না করেছেন। এই সুদীর্ঘ সময়ে উভয়ের মধ্যে যে বোঝা-পড়া ছিল, জগতের খুব কম দম্পতির মধ্যেই তেমনটি দেখা যায়। হযরতের জীবনে বিবি খাদিজার ভূমিকা খুবই বড়। বিবি খাদিজা হযরতকে শুধু সংসারধর্মই শিক্ষা দেন নি, তাঁর সামগ্রিক বিকাশের দিকেও তিনি বিশেষভাবে নজর রাখতেন ।আসলে বিবি খাদিজা ছিলেন হযরতের অসাধারণত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ আস্থাবান। তাই হযরতের কোনো কাজে, তাঁর কোনো ইচ্ছায় তিনি কখনো বাধা দেন নি।

পক্ষান্তরে হযরতও জানতেন, বিবি খাদিজাই তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় আশ্রয়স্থল, সবচেয়ে বড় প্রেরণা। এই দুই নর-নারী কেউ অপরের আত্মিক সৌন্দর্য সম্পর্কে সন্দিহান ছিলেন না। আর পারস্পরিক এই বিশ্বাসই ছিল তাঁদের সমঝোতার প্রধান ভিত্তি।

হযরতের বয়স যখন পঞ্চাশ, বিবি খাদিজার বয়স তখন পঁয়ষট্টি। ততদিনে তাঁদের দাম্পত্যজীবনের দুই দুইটি যুগ অতিবাহিত হয়ে গেছে। অর্থাৎ বিয়ের দুই যুগ পর পঁয়ষট্টি বছর বয়সে বিবি খাদিজা ধরাধাম ত্যাগ করেন।

বিবি খাদিজার জীবিতকালে হযরত দ্বিতীয়বার বিয়ে করেন নি। বিবি খাদিজার মৃত্যুর পর নানা সময়ে নানা প্রয়োজনে হযরত আরো কয়েকটি বিয়ে করেছিলেন। কিন্তু স্ত্রী হিসেবে বিবি খাদিজার স্থান সবার উপরে হযরতের যৌবনের শ্রেষ্ঠ সময়টি কেটেছে বিবি খাদিজার সান্নিধ্যে। কবি গোলাম মোস্তফা যথার্থই বলেছেন, 'এই বিবাহ দ্বারাই আল্লাহ্‌র রসুল সত্যিকারভাবে মাটির মানুষ সাজিলেন।'

২১

বিবি খাদিজার গর্ভে হযরতের সাতটি সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। এঁদের মধ্যে তিনজন পুত্র ও চারজন কন্যা। পুত্রদের নাম কাসেম, তাহের ও তৈয়ব। হযরত চল্লিশ বছর বয়সে পদার্পণের পূর্বেই সব পুত্র ইন্তেকাল করেন। তাঁর কন্যাদের নাম জয়নব, রোকেয়া, উম্মে কুলসুম ও ফাতিমা। একমাত্র ফাতিমা ছাড়া বাকী সবাই হযরতের জীবদ্দশায় মৃত্যুবরণ করেন।

বিবি খাদিজা ও হযরতের মন একটি পুত্র সন্তানের জন্য আকুল হয়ে উঠেছিল। এক অদ্ভুত উপায়ে আল্লাহ্ তাঁদের এই দুঃখ দূর করলেন।

একবার 'ওকাজ' মেলা থেকে বিবি খাদিজা 'জায়েদ' নামক একটি বালককে দাস হিসেবে কিনে নেন। অতঃপর তিনি হযরতের সেবা-শুশ্রূষার জন্যে সেই বালককে নিয়োজিত করেন।

বালক জায়েদকে দেখেই হযরতের মন অপরূপ স্নেহে পূর্ণ হয়ে উঠলো। তাঁর পুত্রহীন হৃদয় কেমন যেন হাহাকার করে উঠলো। তিনি জায়েদকে তৎক্ষণাৎ মুক্তি দিয়ে তাঁকে যেখানে খুশি সেখানে যাওয়ার অনুমতি দিলেন। কিন্তু হযরতের সংস্পর্শে আসা মাত্রই জায়েদের হৃদয়ও এক অভূতপূর্ব আলোকে পূর্ণ হয়ে উঠেছিলো। বালক জায়েদ কোন অবস্থাতেই হযরতকে ছেড়ে যেতে রাজী হলো না। এমনকি, তারো বেশ

কিছুদিন পরে যখন জায়েদের পিতা ও চাচা এসে মুক্তিপণ দিয়ে জায়েদকে মুক্ত করতে চাইলো, তখনও জায়েদ হযরতের সঙ্গ ছাড়তে রাজী হলো না। হযরত জায়েদের পিতাকে বললেন, 'জায়েদ মুক্ত, তাঁকে নিয়ে যেতে কোনো মুক্তিপণ লাগবে না।' কথাগুলো শুনতে কেমন যেন অবিশ্বাস্য ঠেকেছিলো জায়েদের পিতার কানে। কিন্তু জায়েদের মুখ থেকে সব কিছু শোনার পর হযরতের প্রতি এক অভূতপূর্ব শ্রদ্ধায় তাঁদের অন্তর পূর্ণ হয়ে উঠলো। তাঁরা নিশ্চিন্তে জায়েদকে হযরতের কাছে রেখে বাড়ি ফিরে গেলেন।

জায়েদ যে মুক্ত, জায়েদ যে আর ক্রীতদাস নয় — একথা হযরত প্রকাশ্যে ঘোষণা করলেন। কাবাগৃহে প্রবেশ করে তিনি উপস্থিত সকলকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'আজ থেকে জায়েদ আমার পুত্র।'

হযরতের দৃষ্টিতে মানুষের মধ্যে ভেদাভেদ নেই, ছোট-বড় নেই, দাস-প্রভু নেই। জায়েদকে মুক্ত ঘোষণা করে আসলে হযরত ইসলামের সাম্যবাদী নীতিরই ঘোষণা প্রদান করলেন। 'সব মানুষই সমান' — ইসলামের এই নীতি প্রত্যেক মানুষের বিকাশের জন্য অমিত সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করেছে।

জায়েদ চিরদিন হযরতের পাশে পাশে ছিলেন। বলা যায়, জায়েদ ছিলেন হযরতের সর্ব সময়ের ছায়াসঙ্গী। পরবর্তীকালে এই জায়েদ যুদ্ধে সেনাপতি হওয়ারও গৌরব অর্জন করেন।

২২

বিবি খাদিজার সঙ্গে বিয়ের পর হযরতের জীবন এক নতুন খাতে প্রবাহিত হতে থাকলো। বিবি খাদিজার বৈষয়িক ও মানসিক আশ্রয় হযরতের জ্ঞান-সাধনার পথ আরো সহজ করে তুললো। তিনি দিবারাত্র শুধু নিজের ভেতর নিমগ্ন থাকতে শুরু করলেন। এক সর্বব্যাপী অস্তিত্বের স্পন্দন তাঁকে যেন সর্বক্ষণ আলোড়িত করে চলেছে।

হযরতের বয়স তখন পঁয়ত্রিশ। একদিন রাতে ঘুমন্ত অবস্থায় তিনি দেখতে পেলেন, তাঁর সারা শরীর প্রভাতের স্নিগ্ধ আলোর মতো স্বচ্ছ হয়ে

উঠেছে। এর পর থেকে প্রায় প্রতি রাতেই তিনি এই স্বপ্ন দেখতে শুরু করলেন।

হযরতের চিত্ত আকুল হয়ে উঠলো। জীবনে আজ আর কোনো কিছুর অভাব নেই। তবু কিসের এক অপূর্ণতা যেন তাঁকে গ্রাস করে আছে। এক বৃহতের বেদনা তাঁকে যেন মথিত করে ফিরছে।

হযরত সিদ্ধান্ত নিলেন, তিনি লোকালয় ছেড়ে মক্কার অদূরে হেরা-পর্বতের গুহায় বসে নির্জনে আল্লাহ্‌র ধ্যান করবেন। এই ধ্যানের নামই 'মোরাকাবা'। বিবি খাদিজা স্বামীর এই মহাসাধনায় সবধরনের সহযোগিতা প্রদান করলেন। তিনি যথাসময়ে হযরতের জন্য খাদ্য ও পানীয় সরবরাহ করতে লাগলেন।

এ-সময় হযরত প্রায়ই শুনতে পেতেন, কে যেন তাঁর নাম ধরে ডাকছে। কে যেন বলছে, 'মুহম্মদ, তুমি আল্লাহ্‌র রসুল'। কিন্তু পরক্ষণেই বিলীন হয়ে যেতো সেই শব্দ। উত্তেজিত হযরতের সারা শরীরে কম্পন জাগতো। আবেশে তিনি তখন মূর্চ্ছিত হয়ে পড়তেন। সারা শরীর চাদরে ঢেকে কখনো কখনো তাঁকে শুয়ে পড়তে হতো। তখন তাঁর শিয়রে নেমে আসতো বিবি খাদিজার স্নেহময়ী হাত।

২৩

হযরতের বয়স তখন চল্লিশ।

হেরা-পর্বতের নির্জন গুহায় দিনের পর দিন তিনি 'মোরাকাবা'য় মগ্ন।

দেখতে দেখতে রমজান মাস এসে পড়লো।

এ-সময় তিনি রোজা রাখতে শুরু করলেন।

তাঁর ভিতরে-বাইরে যেন তুলকালাম কান্ড শুরু হয়ে গেলো।

প্রতিটি পল-অনুপল তিনি মহান সৃষ্টিকর্তার ধ্যানে উৎসর্গ করলেন।

তাঁর ভিতরে কে যেন বলে উঠলো, 'আর দেরী নেই, আর দেরী নেই।'

২৭শে রমজান, শবে-কদরের রাত।

ধ্যান-মগ্ন হযরত শুনতে পেলেন একটি সুস্পষ্ট কণ্ঠ।

তিনি শুনলেন, কে যেন তাঁকে নাম ধরে ডাকছে, 'মুহম্মদ'।

হযরত চোখ খুললেন।
সঙ্গে সঙ্গে এক অজানা বিস্ময়ে তাঁর হৃদয় সচকিত হলো।
তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে আছেন একজন জ্যোতির্ময় পুরুষ।
আর সারা ঘর যেন ভেসে যাচ্ছে আলোর বন্যায়।
ইনিই আল্লাহ্‌র বার্তাবাহক, ইনিই হযরত জিব্রাইল (আঃ)।
যুগে যুগে আল্লাহ্‌র বাণী নিয়ে ইনিই নেমে এসেছেন ধরার ধুলায়।
হযরত জিব্রাইল (আঃ) হযরত মুহম্মদ (সঃ)–এর সম্মুখে খুলে ধরলেন আলোর অক্ষরে লেখা এক মহাবাণী। বললেন, 'পাঠ করো।'
হযরত মুহম্মদ (সঃ) বললেন, 'আমি তো পড়তে জানি না।'
হযরত জিব্রাইল (আঃ) পরম আত্মীয়ের মতো মুহম্মদ (সঃ) কে বুকে টেনে নিলেন, আলিঙ্গন করলেন। সঙ্গে সঙ্গে মুহম্মদের (সঃ) মনে হলো, তিনি যেন অন্য মানুষে পরিণত হচ্ছেন, তাঁর হৃদয় যেন প্রসারিত হচ্ছে। জিব্রাইল (আঃ) আবার বললেন, 'পাঠ করো।'

প্রায়–কম্পিত কণ্ঠে মুহম্মদ (সঃ) উত্তর দিলেন, 'আমি তো পড়তে জানি না।' জিব্রাইল (আঃ) আবার তাঁকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করলেন। মুহম্মদের (সঃ) সমস্ত শরীর যেন আলোকে আলোকময় হয়ে উঠলো। তৃতীয় বার জিব্রাইল (আঃ) হযরতকে আলিঙ্গন করার পর তিনি সমস্ত দ্বিধা ও অন্ধকারের কবল থেকে মুক্তি পেলেন।
তিনি অকম্পিত কণ্ঠে পড়তে শুরু করলেন সেই আলোকবাণী ঃ

ইক্‌রা বিস্‌মে রাব্বেকাল লাযী খালাক।
খালাকাল ইনসানা মিন আলাক।
ইক্‌রা ওয়ারাব্বুকাল আকরামুল্লাযী–
আল্লামা বিল কালাম।
আল্লামাল ইনসানা মা'লাম ইয়ালাম।

"(হে মুহম্মদ), পাঠ করো তোমার সেই প্রভুর নামে,
যিনি (সব কিছু) সৃষ্টি করেছেন,

যিনি মানবকে ঘনীভূত রক্ত (পিন্ড) থেকে সৃষ্টি করেছেন।
পাঠ করো, তোমার সেই মহামহিম প্রভুর নামে,
যিনি লেখনীর সাহায্যে জ্ঞানশিক্ষা দিয়েছেন,
যিনি মানুষকে না-জানা বিষয়ে জ্ঞান দান করেছেন।"

(*কুরআন* ৯৬-১)

নাজেল হলো প্রথম অহি।
নবুয়ত প্রাপ্ত হলেন হযরত মুহম্মদ মোস্তফা (সঃ)।
জগতের সর্বশেষ প্রতিশ্রুত নবী সত্যের বাণীতে বিভূষিত হলেন। সেই মহামুহূর্তে ধুলোমাটির মানুষ মুহম্মদ বিশ্বজ্ঞানের সংস্পর্শে এসে উপনীত হলেন এক মহা উপলব্ধির দ্বারপ্রান্তে। পৃথিবীর মানুষের জন্যে নিয়ে এলেন এক নতুন সংবাদ।

২৪

'অহি' অর্থ ঐশীবাণী। 'অহি' অর্থ আল্লাহ্‌র কাছ থেকে তাঁর নবী ও রসুলদের কাছে পাঠানো বাণী।

হযরত জিব্রাইল (আঃ) সরাসরি এই বাণী আল্লাহ্‌র প্রেরিত পুরুষদের কাছে নিয়ে আসেন। কিংবা স্বপ্নেও আল্লাহ্‌তাআলা 'অহি' প্রেরণ করে থাকেন।

একটি বিশেষ যুগে যেমন নবী ও রসুলের আবির্ভাব ঘটে, তেমনি নবী ও রসুলদের জীবনের বিশেষ বিশেষ প্রয়োজনের মুহূর্তে 'অহি' নাজিল হয়ে থাকে।

নবুয়ত-প্রাপ্তির লগ্নে হযরত মুহম্মদ (সঃ)-এর জীবনেও সঙ্গতভাবে নাজিল হলো প্রথম 'অহি'। অতঃপর হযরত মুহম্ম (সঃ)-এর সারা জীবনে অসংখ্য 'অহি' নাজিল হয়। পবিত্র কুরআন সেই সব 'অহি' নিয়ে সংকলিত আসমানী গ্রন্থ। এই গ্রন্থ সকল জ্ঞানের আকর।

প্রথম 'অহি'-তে মানুষের দুইটি প্রধান কর্তব্য ঘোষণা করা হলো। এক, সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্; অতএব মানুষকে তাঁর উপাসনা করতে হবে।

দুই, মানুষের জন্যে তিনি জ্ঞানের দরজা উন্মুক্ত করলেন। অতএব মানুষকে সব রকম জ্ঞান আহরণ করতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি মানুষকে তার সৃষ্টি–রহস্য সম্পর্কেও তাৎপর্যময় ইঙ্গিত প্রদান করলেন।

মানুষের কল্যাণ সাধন করতে হলে মানুষকে তার কর্তব্য সম্বন্ধে সজাগ করতে হবে। এই কর্তব্য হচ্ছে, নিজের উৎস সম্পর্কে সজাগ হওয়া আর নিজের ভেতরকার অজ্ঞানতার অন্ধকার দূরীভূত করা। জীবনে যিনি কোনো পাঠশালার পাঠ নেন নি, তাঁর মুখ থেকেই প্রথম উচ্চারিত হলো, 'পাঠ করো'। নবুয়তের শুরু থেকেই এভাবে হযরত মুহম্মদ (সঃ) অজ্ঞানতা ও কুসংস্কারের অন্ধকারে নিমজ্জিত মানুষের মুক্তির সাধনায় নিয়োজিত হলেন।

২৫

'অহি' লাভের কিছুক্ষণ পরেই পূর্বাকাশে আলোর রেখা দেখা দিলো। হযরত জ্ঞানের সেই চির–ভাস্বর জগৎ থেকে নেমে এলেন চারপাশের মাটির পৃথিবীতে। তিনি গৃহের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন।

কিন্তু তাঁর দৃষ্টিপথে তখনো জ্বল জ্বল করছে সেই জ্যোতির্ময় প্রতিচ্ছবি। তিনি তখনো দেখতে পাচ্ছেন, অকাশ ও পৃথিবীর মাঝপথ আলোকিত করে দাঁড়িয়ে আছেন সেই স্বর্গীয় বার্তাবাহক। হঠাৎ তাঁর শরীরে কম্পন শুরু হলো। তিনি বিবি খাদিজাকে বললেন তাঁকে শুইয়ে দিতে। বিবি খাদিজা শায়িত হযরতের শরীর আগাগোড়া চাদর দিয়ে ঢেকে দিলেন।

বিবি খাদিজা হযরতের কাছ থেকে সব ঘটনা আদ্যোপান্ত শুনলেন। তাঁর মনে স্থির বিশ্বাস হলো, হযরত একজন মহামানবে পরিণত হয়েছেন। তবু তিনি নিঃসংশয় হওয়ার জন্যে তাঁর খুল্লতাত পুত্র অর্কার শরণাপন্ন হলেন। অর্কা–বিন–নওফেল ছিলেন বাইবেলে জ্ঞানসম্পন্ন একজন সাধকপুরুষ। তিনি বাইবেলে বর্ণিত প্রতিশ্রুত শেষ নবীর কথা জানতেন। সমস্ত ঘটনা শোনার পর তিনি আনন্দে চিৎকার করে উঠলেন, "কুদ্দুসুন ! কুদ্দুসুন !

অতি পবিত্র, অতি পবিত্র।" অর্কা যা বললেন, তার সারমর্ম হলোঃ হযরত মুহম্মদ (সঃ) যার দেখা পেয়েছেন, তিনি 'নামুসে-আকবর' বা বেহেশ্‌তী দূত। কেবল আল্লাহ্‌র নবী ও রসুলগণই তাঁদের সাক্ষাৎ পান। হযরত মুসা (আঃ) ও ঈসা (আঃ)-এর প্রতি যে নামুসে-আকবর প্রেরিত হয়েছিলেন, হযরত মুহম্মদ (সঃ)-এর কাছেও সেই নামুসে-আকবরই প্রেরিত হয়েছেন।

হযরতের নবুয়তপ্রাপ্তি সম্পর্কে সন্দেহমুক্ত হওয়ার পর বিবি খাদিজা হৃষ্ট মনে গৃহে প্রত্যাবর্তন করলেন। হঠাৎ তিনি অর্কার ডাকে ফিরে তাকালেন। তিনি দেখলেন, অর্কার মুখে নেমে এসেছে বিষাদের ছায়া। অর্কা বললেন, অচিরেই মুহম্মদ তাঁর স্বজাতি কর্তৃক স্বদেশ থেকে বিতাড়িত হবেন। যুগে যুগে প্রেরিত পুরুষের ভাগ্যে ঘটেছে এই বিড়ম্বনা। শুনে বিবি খাদিজার মনও বিষণ্ন হয়ে উঠলো।

২৬

তারপর প্রায় ছয়মাস অতিবাহিত হতে চললো। কিন্তু হযরতের কাছে আর কোনো 'অহি' এলো না। হযরত ভাবলেন, নিশ্চয়ই কোথাও কোনো ভুল হয়ে গেছে। নিশ্চয়ই তিনি আল্লাহ্‌র বিরাগভাজন হওয়ার মতো কোনো কাজ করেছেন।

দ্বিধা ও দ্বন্দ্বের মধ্যে দোল খেতে খেতে হযরতের মন ও মানসিকতা বিষাক্ত হয়ে উঠলো। তিনি চরমভাবে ভেঙে পড়ার মুখে এসে পড়লেন। ঠিক এমনি সময়ে আবির্ভূত হলেন আল্লাহ্‌র বার্তাবাহক সেই জ্যোতির্ময় পুরুষ হযরত জিব্রাইল (আঃ)। অহির মাধ্যমে হযরতের কাছে নাজিল হলো 'সুরা-অদ-দোহা'। আশ্চর্যের কথা এই যে, এই সুরায় হযরতের প্রতি শুধু সান্ত্বনা-বাক্যই বর্ষিত হয়নি, সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে (মানুষকেও) তাঁর সৃষ্টিকর্তার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকার জন্যেও নির্দেশ দেয়া হলো। এই সুরার ভাবানুবাদ নিম্নরূপ ঃ

"উষার শপথ

এবং অন্ধকার রজনীর শপথ।
তোমার প্রভু তোমাকে পরিত্যাগ করেন নি
কিংবা অসন্তুষ্ট হন নি।
এবং শীঘ্রই তোমার প্রভু তোমাকে এমন কিছু দান করবেন,
যাতে তুমি পরিতৃপ্ত হবে।
তিনি কি তোমাকে এতিম বালকরূপে দেখেন নি
এবং আশ্রয় দান করেন নি?
এবং তিনি কি তোমাকে পথহারা অবস্থায় দেখেন নি
এবং সুপথ দেখান নি?
এবং তিনি কি তোমাকে অভাবগ্রস্ত দেখেন নি
এবং অভাবমুক্ত করেন নি?
অতএব যে অনাথ, তাকে তুমি উৎপীড়ন করো না;
যে ভিক্ষুক, তাকে তুমি তিরস্কার করো না;
এবং তোমার প্রভুর অনুগ্রহের কথা প্রচার করো।"

এই সূরা অবতীর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হযরতের মন প্রশান্তিতে ভরে উঠলো। তিনি মহান আল্লাহ্‌র প্রতি তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ্‌তালা তাঁকে সত্যপ্রচারের আদেশ দিলেন। হযরতের মন এক ঐশ্বরিক ঐশ্বর্যে ভরপুর হয়ে গেলো। সত্যপ্রচারের আদেশ লাভ করার পর তিনি কর্তব্য পালনে ব্রতী হলেন। তাঁর মুখ থেকে নিঃসৃত হলো ইসলামের মূল বাণী ঃ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহম্মাদুর রসুলুল্লাহ্‌। আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কোনো উপাস্য নেই; মুহম্মদ আল্লাহ্‌র প্রেরিত পুরুষ।

২৭

শুরু হলো আরেক জীবন।

আল্লাহ্‌র আদেশে সত্যধর্ম প্রচারই এখন তাঁর একমাত্র কাজ।

বিবি খাদিজাকে তিনি সব কিছু বিস্তারিতভাবে বুঝিয়ে বললেন। আর বিবি খাদিজাও যেন মনে-প্রাণে এই মুহূর্তটির জন্যই অপেক্ষা করছিলেন।

স্বামীর সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে তিনিও উচ্চারণ করলেন ঃ আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই, মুহম্মদ আল্লাহ্‌র প্রেরিত পুরুষ। বিবি খাদিজাই হযরতের কাছে দীক্ষাপ্রাপ্ত প্রথম মুসলমান। বিবি খাদিজার পর হযরত আলী, হযরত অর্কা-বিন-নওফেল, হযরত আবু বকর ও হযরত জায়েদ-ইবনে-হারিসা ইসলাম গ্রহণ করেন। অতঃপর কিছুদিনের মধ্যেই হযরত ওসমান, হযরত আম্মার, হযরত বেলাল, হযরত তল্‌হা, হযরত আবুযর গিফারী, হযরত সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্‌কাস প্রমুখ ইসলাম গ্রহণ করলেন।

বিবি খাদিজার পর মহিলাদের মধ্যে যাঁরা সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করলেন, তাঁরা হলেন, আব্বাসের স্ত্রী ওম্মল-ফজল, আমিসের কন্যা আসমা, আবু বকরের কন্যা আসমা, ওমরের ভগ্নী ফাতেমা, হযরতের ধাত্রী উম্মে-আয়মান প্রমুখ।

প্রথম তিন বছর হযরত গোপনেই প্রচার-কাজ চালালেন। ইসলামের সমস্ত কাজ-কর্ম সাধারণ মানুষের অগোচরেই সম্পন্ন হতো। যাঁরা ঈমান এনে মুসলমান হয়েছেন, তাঁদের অনেকেই হযরতের সঙ্গে দূর পর্বত-প্রান্তরে চলে যেতেন এবং প্রাণভরে আল্লাহ্‌র এবাদত করতেন। কিন্তু এতো সতর্কতা সত্ত্বেও ইসলাম ধর্মের কথা অনেকেই জানতে পারলো। অনেক কোরেশনেতা, এমনকি হযরতের পিতৃব্য আবু তালিবও এ-সম্পর্কে জানতে পারলেন। কোরেশনেতাগণ ব্যাপারটিকে বিশেষ আমল দিলো না। তারা বললো এমন কত ধর্ম তো আসে আর যায়। আবু তালিব ইসলাম গ্রহণ করলেন না। তবে তিনি যে-কোনো বিপদ থেকে হযরতকে রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দিলেন।

২৮

তিন বছর গোপনে ইসলাম প্রচারের পর হযরত প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচারের আদেশ লাভ করলেন। এ সময় তাঁর কাছে নিম্নোক্ত অহি নাজিল হলো ঃ

(ক) " —এবং তুমি (মুহম্মদ !) নিজের নিকট আত্মীয়বর্গকে (পাপ ও ঈশ্বরদ্রোহিতার অবশ্যম্ভাবী ফল সম্বন্ধে) সতর্ক করিয়া দাও। (১৯-১৫)"

(খ) ' অপিচ তোমার প্রতি যে আদেশ হয়, তাহা তুমি স্পষ্ট করিয়া শুনাইয়া দাও এবং মুশরিকদের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করিও না। (১৫–৬)"

(—মোস্তফা চরিত। মোহাম্মদ আকরম খাঁ, পৃ. ৩২৮)

সত্যের আলোকে হযরতের অন্তর আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। তিনি অনতিবিলম্বে কোরেশদের মধ্যে প্রকাশ্যে প্রচার–কাজ শুরু করার সিদ্ধান্ত নিলেন। বিবি খাদিজা ও হযরত আলীর সঙ্গে পরামর্শক্রমে স্থির হলো, চল্লিশ জন কোরেশনেতাকে একটি ভোজ–সভায় আমন্ত্রণ করে তাঁদের কাছে ইসলামের দাওয়াৎ পৌঁছে দেওয়া হবে। ভোজ–সভায় সবাই উপস্থিত হলেন। কিন্তু খাওয়া-দাওয়ার পর হযরত কথা শুরু করার আগেই আবু লাহাব একটা গন্ডগোল পাকিয়ে তুললো। আবু লাহাব পূর্ব থেকেই এই ভোজ–সভার উদ্দেশ্য আঁচ করতে পেরেছিলো। ফলে হযরত কোনো কথা বলারই সুযোগ পেলেন না। এ ঘটনায় হযরত বুঝতে পারলেন, সত্য–প্রচারের ক্ষেত্রে পদে পদে বাধা আসবে। কাজেই তাঁকে দমলে চলবে না। তিনি বুঝতে পারলেন, সত্যের পথ কোনোমতেই কুসুমাস্তীর্ণ নয়। কিছুদিনের মধ্যেই আরেকটি ভোজ--সভার আয়োজন করা হলো। এবার তিনি আবু লাহাবকে কোনো গোলমাল পাকানোর সুযোগই দিলেন না। তিনি উদাত্ত কণ্ঠে আহ্বান করলেন, "সমবেত সুধীবৃন্দ ! আমি আপনাদের কাছে ইহকাল ও পরকালের মঙ্গলের জন্য এক মহান সংবাদ নিয়ে এসেছি। আমার পূর্বে আরবের কোন ব্যক্তি স্বজাতির জন্য এমন বাণী আনয়ন করেনি। সত্যের পথে, আল্লাহ্র পথে, আমি আপনাদেরকে আহ্বান করছি। বলুন, এই পথে কে আমার সঙ্গী হতে রাজী আছেন ? বলুন, কে আমার সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে বলতে চান, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ ?' হযরতের বক্তব্য শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আবু লাহাব ও অন্যান্য কোরেশনেতা তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলো। তাঁরা হযরতকে ধর্মদ্রোহী ও কুলাঙ্গার বলে তিরস্কার করলো। কেউ কেউ বললো, মুহম্মদের মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটেছে। অতএব তাকে বন্দী করে রাখা উচিত। ঠিক এই সময়েই বালক হযরত আলী সকলের সামনে উচ্চকণ্ঠে

ঘোষণা করলেন, "হে আল্লাহ্‌র রসুল, আল্লাহ্‌র পথে আমি আপনার সঙ্গী হতে রাজী আছি। এই মহাব্রত গ্রহণে আমি সম্পূর্ণ প্রস্তুত।"

বালক আলীর কথা শুনে কোরেশপ্রধানগণ মুহূর্তের জন্যে স্তম্ভিত হয়ে গেলো। অতঃপর তারা বিদ্রূপের স্বরে আলীর পিতা আবু তালিবকে বললো, "হে আবু তালিব, এবার থেকে তোমাকে বোধ হয় তোমার এই বালকপুত্রের কথামতোই চলতে হবে।"

পর পর দুটি ভোজ–সভায় কোরেশরা ইসলামের দাওয়াৎ লাভ করলো। এর ফলে একটি বিশেষ লাভ হলো এই যে, মক্‌কার ঘরে ঘরে প্রত্যেকেই ইসলাম ধর্ম, আল্লাহ্‌ ও আল্লাহ্‌র রসুলের কথা জানতে পারলো। এমনকি ক্রমে ক্রমে তা সারা আরবভূমিতে ছড়িয়ে পড়লো। অনেকেই ইসলামের প্রতি অনুরক্ত হয়ে উঠলো। কিন্তু প্রকাশ্যে ইসলাম গ্রহণ করতে তখনো অনেক দ্বিধা। লোক–লজ্জার ভয় তো আছেই, তদুপরি এতদিনকার পূর্ব–পুরুষের ধর্ম ত্যাগ সহজ কথা নয়। তবে যতই দিন যেতে লাগলো, ততই তাদের কুসংস্কারে ক্রমাগত আঘাত পড়তে লাগলো।

এই সময় হযরত আরো ব্যাপকভাবে প্রচারের কথা ভাবলেন। ভেবে ভেবে তিনি একটি অভিনব পথও বের করে ফেললেন। মক্‌কার অদূরে একটি পর্বতের নাম সাফা। বিশেষ কারণে এই পর্বতটি মক্‌কাবাসীদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। নিয়ম ছিল, কোনো বিপদের আশঙ্কা দেখা দিলে কিংবা কেউ প্রকাশ্য বিচারপ্রার্থী হলে সাফা পর্বতের শিখরে আরোহণ করার পর বিশেষ কিছু সাংকেতিক শব্দ উচ্চারণ করে চিৎকার করতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে মক্‌কাবাসীরা পর্বতের পাশে জড়ো হতো। হযরত একদিন এক সুন্দর প্রভাতে সেই সাফা পর্বতের উপর দাঁড়িয়ে সাংকেতিক চিৎকার শুরুকরলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে মক্‌কার আবালবৃদ্ধবণিতা সাফা পর্বতের পাশে জড়ো হলো। হযরত তাদের উদ্দেশ্যে বললেন, "আজ যদি আমি বলি এই পর্বতের পেছনে একদল হিংস্র সেনা মক্‌কা আক্রমণে উদ্যত, তাহলে কি আপনারা আমার কথা মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেবেন?" সমবেত মক্‌কাবাসী উত্তর দিলো, "না, কখনও না। কারণ তুমি আমাদের 'আল–আমিন'। তুমি কখনও মিথ্যা বলতে পারো না।"

মক্কাবাসীর এই উত্তরে হযরতের অন্তরে সত্যের শিখা আরো প্রদীপ্ত হয়ে উঠলো। তিনি প্রবল উৎসাহে অকম্পিত কণ্ঠে তাদের উদ্দেশ্যে ঘোষণা করলেন, "তাই যদি হয়, তাহলে আপনারা সবাই বিশ্বাস করুন, আজ আপনারা সবাই বাস্তবিকই এক মহাবিপদের সম্মুখীন। একদল পাপিষ্ঠ সেনা সত্যি সত্যিই আপনাদেরকে গ্রাস করার জন্য উদ্যত। আপনারা আজ আল্লাহ্কে বিস্মৃত হয়ে ঘোর পাপাচারে লিপ্ত। এর জন্য অপেক্ষা করছে কঠোরতম দন্ড। হে আবদুল মোতালেবের বংশধরগণ, হে আবদ্ মোনাফের বংশধরগণ, হে জোহ্রার বংশধরগণ (এভাবে তিনি প্রত্যেক গোত্রের লোকদেরকে সম্ভাষণ করলেন), আমার আত্মীয়স্বজনকে উপদেশ দিয়ে এই মহাবি পদ থেকে রক্ষা করার জন্য আমার প্রতি আল্লাহ্র আদেশ এসেছে। আপনারা যতক্ষণ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলবেন না, ততক্ষণ আপনারা ইহকাল ও পরকালের মঙ্গল লাভ করতে পারবেন না।"

হযরতের কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আবু লাহাব ক্ষিপ্ত হয়ে তাঁকে অভিশাপ দিলো, 'তোর সর্বনাশ হোক। এই জন্যই কি তুই আমাদেরকে জড়ো করিয়েছিলি?'

সমবেত কোরেশগণ আবু লাহাবের কথায় সায় দিয়ে ঘরে ফিরে গেলো।

২৯

হযরতের উৎসাহ বাড়লো বৈ কমলো না। তিনি দেখলেন, সত্যের ঘোষণা মানুষের অন্তরে প্রবেশ করতে শুরু করেছে। শিগ্গীর না হোক, বিলম্ব হলেও এর ফল ফলবেই ফলবে।

একদিন হযরত ঠিক করলেন, তিনি কাবা শরীফের ভিতরেই সত্যের বাণী ঘোষণা করবেন। হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর তৈরি এই কাবাঘরই তো সত্য-ধর্মের পবিত্রতম উপাসনালয়। সেই উপাসনালয় আজ দেবদেবীর কবল থেকে মুক্ত করতেই হবে।

কাবা শরীফে ঢুকে হযরত গম্ভীর কণ্ঠে ঘোষণা করলেন তৌহিদের বাণী। সে

বাণী শুনে সমবেত সকলেই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো। তারা ভাবলো, মুহম্মদ এতদিন পথেঘাটে পাগলামি করে আসছিলো। এখন সে কিনা কাবাঘরে ঢুকেই লঙ্কাকান্ড বাধাতে শুরু করেছে। না, এ কিছুতেই বরদাশ্‌ত করা যায় না। কাবাঘরে উপস্থিত পুতুল উপাসক কোরেশগণ একযোগে হযরতের দিকে তেড়ে এলো। তারা হযরতকে আঘাত করতে উদ্যত হলো। অশ্রাব্য গালিগালাজ করতে লাগলো। এই সর্বপ্রথম হযরত সত্য প্রচারের জন্যে শারীরিকভাবে আক্রান্ত হলেন। হযরত এই বিপদের মুহূর্তে বিবি খাদিজার প্রথম স্বামীর ঔরস-জাত সন্তান যুবক হারিস হযরতকে রক্ষা করার জন্যে এগিয়ে এলেন। হারিস ইতপূর্বেই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। যুবক হারিস ক্ষণিকের জন্যে সব ভয়-ডর বিস্মৃত হলেন। তিনি খালি হাতেই রুখে দাঁড়ালেন অস্ত্রধারী কোরেশদের। সঙ্গে সঙ্গে উত্তেজিত কোরেশদের তরবারির আঘাতে তিনি শহীদ হলেন। এক তরুণ মুসলিমের পবিত্র রক্তে কাবা শরীফ স্নাত হয়ে গেলো। এই হারিস-ইবনে-আবিহালা-ই ইসলামের প্রথম শহীদ।

৩০

হারিস শহীদ হলেন।

ইসলামের প্রচার তবুও থামলো না।

দেখতে দেখতে প্রায় চল্লিশ জন নারী-পুরুষ ইসলাম ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করলো।

প্রতিদিনই একজন দু'জন করে কেউ-না-কেউ ইসলাম ধর্মের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়তে লাগলো।

কোরেশনেতাগণ বিশেষত আবু লাহাব ও আবু সুফিয়ান প্রমাদ গুণতে শুরু করলো।

তারা হযরতের পিতৃব্য আবু তালিবকে বললো, তিনি যেন মুহম্মদকে ইসলাম প্রচার থেকে বিরত রাখেন। আবু তালিব নেতাদের কথায় কর্ণপাত করলেন না। উপরন্তু তিনি মুহম্মদের নিরাপত্তা

বিধানে তৎপর হলেন।

ফলে হযরতকে বাদ দিয়ে কোরেশগণ নব-দীক্ষিত মুসলমানদের উপর নির্যাতন আরম্ভ করলো। নব-দীক্ষিত মুসলমানদের মধ্যে অনেকেই ছিলো ক্রীতদাস। হযরত বেলাল তাঁদের মধ্যে অন্যতম। বেলালের প্রভুর নাম উমাইয়া। উমাইয়া বেলালের উপর অমানুষিক নির্যাতন শুরু করলো। প্রতিদিন বেলালের গলায় পশুর মতো দড়ি বেঁধে শহরের রাস্তায় রাস্তায় টেনে-হেচড়ে আনা হতো। কখনো কখনো দুপুরের খর রৌদ্রে মরুভূমির তপ্ত বালুকার উপর হাত-পা বাঁধা অবস্থায় বেলালকে খালি গায়ে চিৎ করে শুইয়ে রাখা হতো। তাঁর বুকের উপর ভারী পাথরের চাপ। এত কষ্ট, এত অত্যাচার সত্ত্বেও বেলাল সত্যধর্ম থেকে বিচ্যুত হলেন না। বেলালের ত্যাগ বৃথা যায় নি। পরবর্তীকালে এই বেলালই ইসলামের প্রথম মুয়াজ্জিন হওয়ার বিরল সৌভাগ্য লাভ করলেন।

অত্যাচারের যেন কোন শেষ নাই। ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার অপরাধে ইয়াসিরকে দুইটি উটের সাথে বেঁধে নৃশংসভাবে হত্যা করা হলো। ইয়াসিরের স্ত্রী স্বামীর করুণ পরিণতি দেখেও বিন্দুমাত্র বিচলিত হলেন না। তিনি তৌহিদের বলে বলীয়ান হয়ে উচ্চস্বরে ঘোষণা করলেন, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্।

মুহূর্তেই আবু যহলের তীর এসে বিদ্ধ হলো তাঁর বুকে। সুমাইয়া মারা গেলেন।

ইয়াসিরের স্ত্রী সুমাইয়া ইসলামের প্রথম মহিলা শহীদ।
হযরত সব কিছু দুই চোখে দেখলেন, দুই কানে শুনলেন।
কিন্তু কিছুতেই তিনি ধৈর্য হারালেন না।
কোরেশদের উপর তাঁর কোনো রাগও হলো না।
নির্বিকার চিত্তে তিনি সব কিছু মেনে নিলেন।
দেখতে দেখতে পাঁচ বছর কেটে গেলো।

শত বাধা শত নির্যাতন সত্ত্বেও মুসলমানদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেলো।

হযরত তখন এক অদ্ভুত পরিকল্পনা নিলেন।

দশজন নব-দীক্ষিত মুসলমান নারীপুরুষের একটি দল তিনি আফ্রিকার আবিসিনিয়ায় পাঠিয়ে দেবার বন্দোবস্ত করলেন।

ন্যায়-নিষ্ঠ শাসক হিসেবে আবিসিনিয়ার সম্রাটের তখন বেশ নাম-ডাক। মক্কার কোরেশদের অত্যাচার থেকে মুসলমানদের রক্ষা করা এবং সুদূর আফ্রিকায় ইসলামের দাওয়াৎ পৌছানোই এই পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য।

কিছুদিন পর আরো ৮৩ জন মুসলমানকে আবিসিনিয়ায় পাঠানো হলো। কোরেশরা মুসলমানদের দেশত্যাগের হেতু আঁচ করলো। কিন্তু তারা মুসলমানদের দেশত্যাগে বাধা দিতে গিয়ে বিফল হলো। অতঃপর কোরেশনেতারা আবিসিনিয়ার সম্রাটের কাছে দূত পাঠিয়ে মুসলমানদেরকে কোরেশদের কাছে ফেরত দেওয়ার আবেদন করলো। ন্যায়বান সম্রাট নাজ্জাশী কোরেশদের আবেদন প্রত্যাখ্যান করলেন। বরং তিনি তরুণ মুসলমান নেতা জাফরের বক্তব্য শোনার পর মুগ্ধ হয়ে মুসলমানদেরকে নির্ভয়ে আবিসিনিয়ায় বসবাসের অনুমতি দিলেন।

কোরেশরা দেখলো, তাদের সব পরিকল্পনা ভেস্তে যাচ্ছে। ওদিকে মুসলমানদের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে। অতএব তারা এবার নতুন ফন্দি আঁটতে লাগলো। নব-দীক্ষিত মুসলমানদের বাদ দিয়ে তারা এবার স্বয়ং হযরতকে আক্রমণ করার অজুহাত খুঁজতে লাগলো। এ-কাজে অগ্রণী ভূমিকা নিলো আবু যহল। কিন্তু আল্লাহ্‌র কি অপার মহিমা, ক্রমে ক্রমে এই বিরোধিতাও ইসলামের জন্য শাপে বর হয়ে দেখা দিতে লাগলো।

একদিন হযরত সাফা পর্বতের গুহায় একাকী ধ্যানে মগ্ন। এমন সময় আবু যহল এসে তাঁকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করতে লাগলো। কিন্তু এতে হযরতের কোনো প্রকার প্রতিক্রিয়া হলো না। এই দেখে আবু যহল আরো ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো। এক খন্ড পাথর দিয়ে সে হযরতের মাথায় আঘাত করলো। হযরতের সারা শরীর রক্তে ভেসে গেলো। সেই অবস্থাতেও

তিনি কোনোরূপ চঞ্চলতা দেখালেন না। কারো কাছে এই অন্যায়ের বিচার চাইলেন না। তিনি শুধু নিরবে ঘরে ফিরে এলেন।

হযরতের চাচা মহাবীর আমির হামজা তখনো ইসলাম গ্রহণ করেন নি। তবু তিনি ভ্রাতুষ্পুত্রের এহেন অবস্থা দেখে স্থির থাকতে পারলেন না। তীর ও ধনুক হাতে তিনি আবু যহলকে খুঁজে বের করার জন্য ছুটে গেলেন। কাবা শরীফের পাশে আবু যহল তখন অন্যান্য কোরেশের সঙ্গে খোশগল্পে মত্ত। হামজা তাঁর তীর দিয়ে আবু যহলের মাথায় আঘাত করতে করতে বললেন, 'রে কমবখ্‌ত। তুই আমার ভ্রাতুষ্পুত্রের গায়ে হাত তুলেছিস? আজ তোর নিস্তার নেই।'

আবু যহল তখন স্বধর্মের দোহাই দিল।

হামজা এতে আরও ক্ষিপ্ত হয়ে সমবেত কোরেশদের সম্মুখেই নিজেকে মুসলমান হিসেবে ঘোষণা করে বজ্রগম্ভীর স্বরে বলে উঠলেন, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্।"

হামজার মতো মহান বীর ইসলামের অনুসারী হয়ে গেল? সমবেত কোরেশগণ মুহূর্তেই স্তম্ভিত হয়ে পড়লো। তবে কি মুহম্মদের প্রকাশ্য শত্রুতায় কোনো লাভ হবে না? অতএব এবার তারা অন্যপথ ধরলো। হযরতকে ধর্মপ্রচার থেকে বিরত রাখার জন্যে এবার তারা তাঁর মিত্র সাজার ভান করলো। কোরেশনেতারা গদগদ কণ্ঠে হযরতকে বললো, 'হে মুহম্মদ, আমরা সবাই তোমার হিতাকাঙ্ক্ষী। তুমি যা চাও তা-ই আমরা তোমাকে দেব। টাকা-পয়সা, ধনদৌলত, নেতৃত্ব, সুন্দরী নারী — যা তোমার ইচ্ছে। বিনিময়ে কেবল তোমার ঐ অদ্ভুত ধর্মের প্রচার থেকে তুমি বিরত হও।' হযরত বললেন, 'আমার এক হাতে সূর্য আর অন্য হাতে চন্দ্র এনে দিলেও আমি ইসলাম প্রচারে ক্ষান্ত হবো না। ইসলাম কল্যাণের ধর্ম। তোমরা ইসলামের পথে এসো, তোমরা কল্যাণের পথে এসো।'

কোরেশরা দেখলো, মুহম্মদকে প্রলুব্ধ করার চেষ্টাও বৃথা। অতএব, এবার তারা চরম সিদ্ধান্ত নিলো। মুহম্মদকে ধরা-পৃষ্ঠ থেকে চিরতরে সরিয়ে

দিতে হবে। কিন্তু কে করবে এ কাজ? মুহম্মদতো আর একা নয়। হাশিম ও মোত্তালিব বংশের মধ্যে তো আর বীর যোদ্ধার অভাব নেই। কাজেই কার ঘাড়ে কটা মাথা আছে যে, মুহম্মদকে হত্যা করার স্পর্ধা দেখায়? আবু যহল ও আবু সুফিয়ান কৌশলে কাজ সারতে মনস্থ করলো। তারা তরুণদের এক সভা ডেকে তাদেরকে মুহম্মদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করার চেষ্টা করলো। অচিরেই তাদের চেষ্টায় সফলতা দেখা দিলো। তরুণ কোরেশ-বীর ওমর মুহম্মদকে হত্যা করে তাঁর শির কোরেশনেতাদের হাতে এনে দেওয়ার শপথ করে নাঙ্গা তলোয়ার হাতে পথে বেরিয়ে পড়লো।

ওমর যেমনি একরোখা, তেমনি অসমসাহসী যোদ্ধা। ওমরকে ক্ষিপ্ত হতে দেখে আবু যহলের দল আনন্দে আটখানা। এবার দেখা যাবে, মুহম্মদের ঘাড়ে ক'খানা মাথা।

নাঙ্গা তলোয়ার হাতে ওমর ছুটে চলেছে হযরতের খোঁজে। তার দুচোখ থেকে আগুন ঠিকরে পড়তে শুরু করেছে। পথেই ওমর শুনলো, তার বোন ও ভগ্নিপতি ইতোমধ্যেই মুসলমান হয়ে গেছে। আগুনে যেন কেউ ঘি ঢেলে দিলো। ওমরের প্রতিজ্ঞা একটু পরিবর্তিত হলো। প্রথমে সে তার বোন ও ভগ্নিপতির গর্দান নেবে, তারপর মুহম্মদের গর্দানের খোঁজে বেরোবে।

ভগ্নিপতির ঘরের কাছে আসতেই ওমরের কানে ভেসে এলো এক অপরূপ সুরেলা ধ্বনি। কণ্ঠটি তার বোনের, কিন্তু সুর আর ছন্দটুকু অচেনা। ওমর যতই গৃহের নিকটবর্তী হতে লাগলো, ততই সেই সুর তার কানের মধ্য দিয়ে মর্মে আঘাত হানতে শুরু করলো। ওমর শুধু বীরযোদ্ধাই নয়, একজন বিদ্যানুরাগীও। ওমর ঘরের ভিতর ঢুকতেই তার বোন ফাতিমার মুখ ভয়ে শুকিয়ে গেলো। ওমর দেখলো, ফাতিমা একখন্ড পত্র তাড়াতাড়ি তার আঁচলের মধ্যে লুকিয়ে ফেলছে।

ওমর ফাতিমাকে জিগ্গেস করলো, 'ফাতিমা, তুমি কি মুহম্মদের ধর্মে দীক্ষা নিয়েছো?' ফাতিমা কি উত্তর দেবে বুঝতে পারলো না। কিন্তু পরক্ষণেই তার হৃদয় এক অপূর্ব শক্তিতে উদ্দীপিত হলো। দৃঢ় কণ্ঠে ফাতিমা বললো, 'আমি আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের ধর্মে দীক্ষা নিয়েছি।' ওমর বললো,

'তুমি কি পাঠ করছিলে?'

ফাতিমা বললো, 'আমি আল্লাহ্‌র কালাম তেলাওয়াত করছিলাম।' ওমরের অনুরোধে ফতিমা তার সুললিত কণ্ঠে আবার সেই মহাবাণী পাঠ করলো। মন্ত্রমুগ্ধের মতো ওমর শুনলো সেই বাণী। একবার, দুবার, তিনবার। শুনতে শুনতে তার চোখ থেকে অঝোর ধারায় নেমে এলো অশ্রু। ওমরের বুঝতে আর বাকী রইলো না, এই বাণী কোনো মানুষের নয়। এই বাণীর উৎস যিনি, তিনি সর্বশক্তিমান।

ওমর নির্বাক পাথরের মতো স্তব্ধও নিশ্চল।

হঠাৎ তার পায়ে গতির সঞ্চার হলো। যে বেগে ওমর ফাতিমার ঘরে এসেছিলো, তারো চেয়ে দ্রুতবেগে ওমর হযরতের খোঁজে ধাবিত হলো। ইতোমধ্যেই সর্বত্র খবর ছড়িয়ে পড়েছে। সবাই জেনে গেছে, ওমর নাঙ্গা তলোয়ার হাতে হযরতকে হত্যা করার জন্যে ছুটে আসছে। আবু বকর, হামজা, আলী ও অন্যান্য মুসলমান বীর হযরতকে রক্ষার জন্যে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিলেন। তাঁরা ওমরের গতিরোধ করার জন্যে হযরতের অনুমতি চাইলেন। কিন্তু কী আশ্চর্য, হযরতের মুখে চিন্তার কোনো ছাপ নেই। হযরত ইঙ্গিতে সকলকে থামতে বললেন। ওমরকে আসতে দেখে তিনি একাই অস্ত্রহীন অবস্থায় ওমরের দিকে এগোতে লাগলেন। ভক্তরা প্রমাদ গুণলো। কিন্তু হযরতের কথার উপর কথা বলতে কেউ সাহসী হলো না।

ওমর কাছে আসতেই হযরত তার শরীর স্পর্শ করলেন। ওমরের শরীরে যেন বিদ্যুতের শক লাগলো। সবাই দেখলো, ওমরের চোখে মুখে ক্রোধের কোনো চিহ্ন নেই।

তার হাতের নাঙ্গা তলোয়ার হত্যার জন্যে উদ্যত হলো না। মুখ থেকে নির্গত হলো না কোনো অশ্রাব্য শব্দ। একজন অবোধ বালকের মতো বিস্মিত ও মুগ্ধ নয়ন মেলে ওমর শুধু তাকিয়ে রইলো হযরতের দিকে। তার হাতের তলোয়ার ততক্ষণে হযরতের পদতলে। কাঁপা কাঁপা গলায় ওমর বললো, 'হে আল্লাহ্‌র রসুল, আমাকে আল্লাহ্‌র ধর্মে দীক্ষিত করে নিন। ইসলামের একজন নগণ্য সেবক হিসেবে আমাকে আপনার চরণতলে আশ্রয় দিন।'

কোরেশরা দেখলো, যে যায় সে আর ফেরে না। অপমানে ও প্রতিহিংসায় কোরেশনেতাদের অন্তর জ্বলে পুড়ে খাঁক হতে লাগলো। তারা ঠিক করলো, মুহম্মদকে, তাঁর আত্মীয়স্বজনকে, তাঁর শিষ্যদেরকে একঘরে করে কোণঠাসা করতে হবে। হাশিম ও মুত্তালিব বংশ ব্যতীত অন্য সকলেই এ বিষয়ে একমত হলো। ফলে আত্মরক্ষার তাগিদেই হযরত, তাঁর অনুসারীবৃন্দ এবং হাশিম ও মুত্তালিব বংশের লোকজনকে 'শেব' নামক একটি সুরক্ষিত গিরি-সংকটে আশ্রয় নিতে হলো। দীর্ঘ দু' বছর তারা সেখানে খাদ্য ও পানীয়ের চরম সংকটের মধ্যে নির্বাসিত জীবন যাপন করলো। অবশেষে কোরেশদের মধ্য থেকে মুতাএম নামক একজন সহৃদয় ব্যক্তি এগিয়ে এলেন। তিনি আবু তালিবের সঙ্গে বসে সলা-পরামর্শ করলেন। দীর্ঘ দু' বছর অশেষ কষ্ট ভোগ করার পর নির্বাসিত ব্যক্তিরা আবার গৃহে ফিরে এলো। বলা বাহুল্য, মুতাএম কখনও মুসলমান হন নি। কিন্তু হযরতের প্রতি এই মুতাএম চিরদিন অভূতপূর্ব স্নেহ প্রদর্শন করে গেছেন। হযরতের চাচা আবু তালিবের মৃত্যুর পর এই সদাশয় ব্যক্তিই হযরতের আশ্রয়দাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হন।

৩১

'শেব' গিরি-সংকট থেকে মক্কা নগরীতে ফিরে আসার কিছুদিনের মধ্যেই বৃদ্ধ আবু তালিব ইন্তেকাল করেন। তখন তাঁর বয়স ৮০ বছর। হযরতের মাথার উপর থেকে এতোদিনকার সবচেয়ে বড় ছায়াটি চিরদিনের জন্যে দূরে সরে গেলো।

পিতৃব্যের শোকে হযরত যেন পাথর হয়ে গেলেন। তখনি এলো পরবর্তী চরম আঘাত। তাঁর দীর্ঘ দুই যুগের সুখ-দুঃখের অংশীদার প্রিয়তমা পত্নী বিবি খাদিজা হঠাৎ পীড়িত হয়ে পড়লেন। কিছুদিনের মধ্যে তিনিও হযরতকে ছেড়ে জান্নাতের অধিবাসিনী হলেন।

ধৈর্য ও সংযমের পরীক্ষা যেন নতুন করে শুরু হলো হযরতের জীবনে। শৈশবে যে বন্ধনমুক্তির পালা শুরু হয়েছিল, আজ যেন তা পূর্ণ হতে চলেছে।

এদিকে কোরেশরা দেখলো, এই তো সুযোগ। হযরতের এই ঘোর দুর্দিনে কোরেশগণ তাঁকে নানাভাবে নাজেহাল করতে শুরু করলো। অবশেষে হযরত মনস্থ করলেন, তিনি মক্কা থেকে বেরিয়ে তায়েফে চলে যাবেন।

এই সেই তায়েফ, যেখানে কেটেছে হযরতের সোনার শৈশব। এই সেই তায়েফ, যার সংস্কৃতি হযরতকে করেছে সংস্কৃতিবান। হযরত ভাবলেন, মার্জিতরুচির তায়েফবাসীরা নিশ্চয়ই তাঁকে অপদস্থ করবে না।

আশায় বুক বেঁধে তিনি তায়েফ নগরীতে প্রবেশ করলেন। পরিচিত, অপরিচিত, ছেলে, বুড়ো, মেয়ে — সকলের কাছে তিনি ইসলামের অমিয় বাণী পৌঁছে দিলেন।

কিন্তু ফল ফললো ঠিক বিপরীত। দুএকদিনের মধ্যেই তায়েফবাসী হযরতের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠলো। তারা হযরতের পেছনে বাচ্চা ছেলেমেয়েদের লেলিয়ে দিলো। ওরা পাথরের আঘাতে হযরতের শরীর রক্তাক্ত করে ফেললো। মারাত্মকভাবে আহত হয়ে হযরত এক সময় সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়লেন।

হযরতের সঙ্গী তাঁর পালিত পুত্র জায়েদ। নিজে আহত হওয়া সত্ত্বেও জায়েদ কোনোমতে হযরতকে কাঁধে করে নিরাপদ জায়গায় এনে রাখলেন। সংজ্ঞা ফিরে এলে হযরত দু' রাকাত নামাজ পড়ে তায়েফবাসীর মঙ্গল কামনা করলেন। সঙ্গে সঙ্গে সাহায্য কামনা করলেন সর্বশক্তিমান আল্লাহ্তালার। ঠিক সেই সময় নাজিল হলো এক অহি। এই অহিতে হযরতকে ধৈর্য ধরতে বলা হলো। আরো বলা হলো, বিজয় আর খুব দূরে নয়।

এই স্বর্গীয় আশ্বাসে হযরতের মন পূর্ণ হয়ে উঠলো। তিনি আবার মক্কায় ফিরে এলেন। আবু তালিব নেই । কিন্তু মোতাএম তো আছেন। মুতাএম হযরতের নিরাপত্তার ভার স্বহস্তে গ্রহণ করলেন।

এই সময় হযরত 'সওদা' নামক একজন সহায় সম্বলহীনা বৃদ্ধা মহিলাকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করে তাঁর ভরণপোষণের দায়িত্ব নিলেন। কিছুদিন পর তিনি আয়েশার সঙ্গে পরিণয়–সূত্রে আবদ্ধ হন। সাত বছরের বালিকা আয়েশা ও তাঁর পিতা আবু বকরের ব্যক্তিগত আগ্রহে হযরতকে এই বিবাহে সম্মত হতে হয়।

৩২

এই সময়ের একটি ঘটনা মক্কাবাসী মুসলমান ও অমুসলমানদের মধ্যে এক দারুণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করলো। এই ঘটনার নাম মিরাজ বা মহাকাশ ভ্রমণ। নবুয়তের দশম বছরে ২৭শে রজব এটি সংঘটিত হয়।

ঘটনাটি সংক্ষেপে এরকম ঃ

একদিন গভীর রাতে হযরত নিদ্রিত অবস্থায় শুনলেন, কে যেন তাঁকে নাম ধরে ডাকছে। তিনি চোখ খুললেন। দেখলেন, হযরত জিব্রাইল (আঃ) তাঁর শিয়রে দাঁড়িয়ে আছেন। কাছেই 'বোরাক' নামক একটি জ্যোতির্ময় স্বর্গীয় শকট।

জিব্রাইল হযরতের হৃদয়ে নতুন শক্তি সঞ্চারিত করে হযরতকে নিয়ে ঐ শকটে আরোহণ করলেন। শকটটি মুহূর্তের মধ্যেই তাঁদেরকে জেরুজালেমের মসজিদে নিয়ে এলো। জিব্রাইলের নির্দেশ মতো হযরত এখানে দু'রাকাত নামাজ আদায় করলেন।

অতঃপর সেখান থেকে যাত্রা করে 'বোরাক' মহাকাশের দিকে ধাবিত হলো। মুহূর্তের মধ্যেই তাঁরা প্রথম আসমানে এসে পৌছলেন। সেখানে হযরত আদমের সঙ্গে হযরতের পরিচয় ও কুশল বিনিময় হলো। অতঃপর এলেন

দ্বিতীয় আসমানে। সেখানে পরিচয় ঘটলো হযরত ঈসার সঙ্গে। ক্রমান্বয়ে তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম আসমানে হযরত মুহম্মদ যথাক্রমে হযরত ইউসুফ, হযরত ইদ্রিস, হযরত হারুন, হযরত মুসা ও হযরত ইব্রাহিমের সঙ্গে পরিচিত হলেন এবং সালাম বিনিময় করলেন।

তারপর আরো উর্ধ্বে উঠার পালা। নিমেষেই তাঁরা 'সিদরাতুল মুন্তাহা' বা দৃশ্যমান মহাকাশের শেষপ্রান্তে এসে উপনীত হলেন। এরপর জিব্রাইল আর এগোতে পারলেন না। এক অসাধারণ শক্তিতে বলীয়ান হয়ে হযরত একাই অসীম দিগন্তের পথে যাত্রা শুরু করলেন। 'বায়তুল মামুর'–এ এসে 'বোরাক' থেমে পড়লো। 'বায়তুল মামুর' কাবা শরীফের ঠিক উর্ধ্বদেশে অবস্থিত। 'বায়তুল মামুর' আসলে কাবা শরীফেরই মূল রূপ। দৃশ্যমান বাস্তবের সঙ্গে 'বায়তুল মামুর'–এর কোনো মিল নেই। এটি একটি ধ্যানজগৎ মাত্র। এখানে ফেরেশ্‌তারা সব সময় আল্লাহ্‌র ধ্যানে রত।

এখানেই হযরত মুহম্মদ (সঃ) আল্লাহ্‌র নিকটতম সান্নিধ্য লাভ করলেন। স্রষ্টা ও সৃষ্টির অজানা রহস্যাবলী তিনি সম্যকভাবে অবহিত হলেন। স্বর্গ ও নরকের দৃশ্য প্রত্যক্ষ করলেন। অতঃপর পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের বিধান নিয়ে তিনি মুহূর্তের মধ্যে কাবা শরীফে ফিরে এলেন। এসে দেখলেন, পৃথিবীতে কোনো কিছুই পরিবর্তিত হয় নি। সব কিছুই চলছে ঠিক আগের মুহূর্তের মতো।

পরদিন হযরত এ ঘটনার কথা সবাইকে বললেন। কোরেশরা ঘটনাটি শুনেই অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো। তারা নানা রকম ব্যঙ্গবিদ্রূপ করতে লাগলো। মুসলমানদের মধ্যেও অনেকে এই ঘটনার সত্যতা সম্পর্কে খানিকটা সন্দিহান হলেন। কিন্তু হযরত আবু বকর যখন রসুলের মুখ থেকে এ ঘটনা শুনলেন, কাল বিলম্ব না করে তিনি তাতে আস্থা স্থাপন করলেন। হযরত সঙ্গে সঙ্গে আবু বকরকে 'সিদ্দিক' বা 'সত্যবাদী' উপাধিতে ভূষিত করলেন।

মিরাজের সত্যাসত্য সম্পর্কে নানা মনীষী নানা কথা বলেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, এটি একটি স্বপ্ন মাত্র। কেউ কেউ বলেছেন, এটি কেবল আধ্যাত্মিক অর্থেই সত্য। আসলে আজ আর এ ধরনের তর্কে প্রবৃত্ত হওয়ার কারণ নেই। আমরা দেখতে পাচ্ছি, যে-সময়ে মহাকাশভ্রমণ দূরে থাকুক, আকাশে উড়ার মতো ন্যূনতম যন্ত্র আবিষ্কারও মানুষের কল্পনার বাইরে, ঠিক সে সময়েই হযরত মিরাজ বা মহাকাশভ্রমণের কথা বলেছেন। বিংশ শতাব্দীর মানুষের কাছে মহকাশভ্রমণের ব্যাপারটি বৈজ্ঞানিক সত্য। কাজেই মিরাজের আইডিয়াও আজ আর অলীক বা বাস্তবতাবর্জিত বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

৩৩

মিরাজের ঘটনার পর হযরতের প্রচারকাজে নতুনভাবে বাধা আসতে আরম্ভ করলো। এমনকি প্রকাশ্যে প্রচারকাজ চালানো তাঁর পক্ষে একরকম অসম্ভব হয়ে দাঁড়ালো। অমুসলমানেরা তাঁর কথা শুনেই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতে লাগলো, মিরাজের ঘটনা ইনিয়ে বিনিয়ে উপহাস করতে শুরু করলো।

দেখতে দেখতে হজ্জের সময় এসে পড়লো। এবার হযরত বিভিন্ন স্থান থেকে আসা বিভিন্ন গোত্রের লোকদের মধ্যে প্রচার কাজ শুরু করলেন। কিন্তু এতেও তেমন ফল ফললো না।

একদিন ঘুরতে ঘুরতে হযরত মক্কার অদূরে 'আল-আকাবা' নামক একটি উপত্যকায় এসে উপস্থিত হলেন। সেখানে ছয়জন যাত্রী বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। হযরত তাঁদের কাছে ইসলামের বাণী প্রচার করলেন। এই হজ্জ-যাত্রীদের সবাই মদিনাবাসী। তাঁরা পূর্বেই হযরতের কথা শুনে-ছিলেন। হযরতের সন্ধান লাভের জন্যে তাঁরা এমনিতেই উন্মুখ ছিলেন।

তাঁরা হযরতের স্বর্গীয় বাণী মনোযোগ সহকারে শুনলেন । অতঃপর ছয় বন্ধুই ইসলাম গ্রহণ করে মদিনায় ফিরে গেলেন। পরবর্তী বছর মদিনা থেকে

আরো হজ্জযাত্রী মক্কায় এলো। এবার সংখ্যায় তাঁরা অনেক। তাঁদের মধ্যে বারোজন হযরতের হাতে হাত রেখে বায়াৎ হলেন। তাঁরা নিম্নোক্ত শপথ পাঠ করলেন ঃ

১ আমরা একমাত্র আল্লাহ্‌র এবাদৎ করবো এবং অন্য কাউকে আল্লাহ্‌র সঙ্গে শরীক করবো না।

২ ব্যভিচার করবো না।

৩ চুরি করবো না।

৪ নিজের ছেলেমেয়েদের হত্যা করবো না।

৫ কারো বিরুদ্ধে চোগলখোরি করবো না।

৬ প্রত্যেক সৎকাজে আল্লাহ্‌র রসুলকে মেনে চলবো; ন্যায্য কাজে তাঁর অবাধ্য হবো না।

ইসলামে এটিই 'আকাবার প্রথম বায়াৎ' নামে পরিচিত। এই ঘটনার মাধ্যমে মদিনায় ইসলাম প্রচারের পথই শুধু প্রশস্ত হলো না, এর ফলে ইসলামের আনুষ্ঠানিক বিজয়ও সূচিত হতে শুরু করলো।

পরবর্তী বছর (৬২২ খৃঃ) হজ্জ উপলক্ষে মক্কায় এসে ৭৩ জন মদিনাবাসী হযরতের কাছে দীক্ষা নিলেন। এই ঘটনাকে 'আকাবার দ্বিতীয় বায়াৎ' বলা হয়।

হযরত মদিনায় ইসলাম প্রচারের বন্দোবস্ত পাকাপোক্ত করলেন। যাঁরা বায়াৎ হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে মদিনার প্রধান প্রধান গোত্রের অনেক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন। তাঁরা স্ব স্ব গোত্রে ইসলাম প্রচারের আশ্বাস দিলেন। তদুপরি যাঁরা সদ্য ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হলেন, তাঁদেরকে ইসলামের নিয়মকানুন ভালভাবে শিক্ষা দিবার জন্যে হযরত মক্কা থেকে মোসাএব-বিন-ওমায়ের নামক একজন ভক্তকে মদিনায় পাঠালেন। মোসাএব মদিনাবাসী মুসলমানদের সর্বাঙ্গীন সহযোগিতা লাভ করলেন। অচিরেই মদিনার ঘরে ঘরে ইসলামের দীপ প্রজ্জ্বলিত হতে শুরু করলো।

মদিনাবাসী অমুসলিমরা মুসলমানদের বাধা দিতে চেষ্টা করেও তেমন সুবিধা করতে পারলো না।

'আকাবার দ্বিতীয় বায়াৎ' অনুষ্ঠিত হওয়ার সময় মদিনাবাসীরা হযরতকে মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করার আহ্বান জানিয়েছিলেন। মক্কায় কোরেশদের অত্যাচারে হযরতের পক্ষে এমনিতেই টেকা দায়। কাজেই তিনি যে মদিনায় যেতে গররাজী ছিলেন, এমন নয়। তবে তিনি শর্ত আরোপ করলেন যে, তিনি একা যাবেন না। তাঁর সাথে তাঁর মক্কাবাসী অনুসারীগণও যাবেন। মদিনাবাসীরা সানন্দে এই প্রস্তাবে রাজী হলেন। আল্লাহ্‌র নবীকে নিজেদের মধ্যে পাওয়ার চেয়ে বড় সৌভাগ্য আর কি থাকতে পারে। সুখে-দুঃখে তাঁরা চিরদিন হযরতের সঙ্গী হয়ে থাকবেন।

মদিনাবাসীরা মদিনা ফিরে গেলেন। হযরত মক্কায় মুসলমানদের নির্দেশ দিলেন, তাঁরা যেন একে একে মদিনায় চলে যান। ঘরবাড়ি, আত্মীয়স্বজন, সহায়-সম্পত্তির চেয়ে আল্লাহ্‌র রসুলের আদেশ অনেক বড়। মক্কাবাসী মুসলমানরা সব মায়ার বন্ধন ছিন্ন করে একে একে মদিনার পথে পা বাড়াতে লাগলেন। কোরেশগণ ক্রমে ক্রমে সব জানতে পারলো। তারা এই হিযরতের মধ্যে একটি গভীর অভিসন্ধি খুঁজে পেলো। যাঁকে তারা মক্কায় থাকতে দেবে না, তাঁকে তারা মদিনায় বা অন্যত্র যেতেও দেবে না। কোরেশগণ পরিস্থিতি পর্যালোচনা করার জন্য গোপন পরামর্শ-সভায় মিলিত হলো। তারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলো যে, মদিনায় সদলবলে হিযরত করার পর মুহম্মদ শক্তি সংগ্রহ করে তাদের প্রতি হুমকি হয়ে দাঁড়াবে। কাজেই শত্রুকে শুরুতেই ধ্বংস করতে হবে। আবু যহলের প্রস্তাবক্রমে স্থির হলো, প্রত্যেক গোত্র থেকে একজন করে যুবক রাতে মুহম্মদের ঘর অবরোধ করবে। প্রভাতে ঘুম থেকে উঠে মুহম্মদ যেই বাইরে আসবে, অমনি সব যুবক একযোগে তাঁকে হত্যা করবে। হাশিম ও মুত্তালিব বংশের লোকজন যাতে এই হত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যে সাহসী হতে না পারে, তজ্জন্যই প্রতিটি গোত্র থেকে সুকৌশলে যুবক বাছাই করা হলো।

যুবকবৃন্দ নির্দিষ্ট রাতে হযরতের গৃহ অবরোধ করলো। তাদের নেতৃত্ব দিলো স্বয়ং আবু যহল। ঘরের ভিতর উঁকি দিয়ে তারা দেখলো, শিকার চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে। তাড়াহুড়া না করে তারা ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে লাগলো। ক্রমে রাত ভোর হলো। সূর্য উঠি-উঠি করছে। কিন্তু ঘুমন্ত ব্যক্তির জাগার নাম নেই কেন?

আবু যহলের ধৈর্যচ্যুতি ঘটলো। বিশ্রী ভাষায় গালমন্দ পাড়তে পাড়তে আবু যহল ঘরে ঢুকে পড়লো। তারপর এক ঝটকায় ঘুমন্ত ব্যক্তির শরীর থেকে চাদর সরালো। সবাই অবাক হয়ে দেখলো, মুহম্মদ নেই, তার পরিবর্তে আড়মোড়া ভাঙতে ভাঙতে আলী বিছানা থেকে গাত্রোত্থান করছেন।

কিছুক্ষণের জন্য আবু যহল ও তার সঙ্গী যুবকদের মুখে কোনো কথা নেই। তারপর মুহম্মদের গোষ্ঠী উদ্ধার করতে করতে সবাই মদিনার পথে ঊর্ধ্বশ্বাসে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলো। তাদের বুঝতে বাকী রইলো না, হযরত এই ষড়যন্ত্রের আঁচ করতে পেরে অনেক পূর্বেই মদিনার পথে পাড়ি জমিয়েছেন।

৩৪

ষড়যন্ত্রের পর ষড়যন্ত্র, ফাঁদের পর ফাঁদ।

হযরতকে না পেয়ে কোরেশ যোদ্ধারা মরুভূমিতে হন্যে হয়ে ছুটছে। ওরা আজ পাগলা কুকুরের মতো হিংস্র।

অসাধারণ উপস্থিত বুদ্ধি, পরিকল্পনা, সর্বোপরি আল্লাহ্‌র অশেষ রহমতে হযরত কোরেশদের সমস্ত ফাঁদ ও ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করলেন। সোমবার, ৬২২ খৃস্টাব্দের ৮ই রবিউল আউয়াল, দ্বিপ্রহর। মহানবী মদিনার অদূরে কোবা পল্লীতে পদার্পণ করলেন।

হযরত ও তাঁর সঙ্গীদের সর্বপ্রথম দেখতে পেলো ইহুদীরা। তারাই হযরতের আগমনী ঘোষণা করলো। মুহূর্তের মধ্যে সারা কোবা পল্লীতে

মানুষের ঢল নামলো। 'আল্লাহু আকবর' ধ্বনিতে মুখরিত হলো আকাশ বাতাস। কোবাবাসীর দীর্ঘপ্রতীক্ষিত অন্তর আজ শান্ত। শান্তির নবী মুহম্মদ মুস্তফা (সঃ) আজ তাদেরই একজন। হযরত কোবা পল্লীতে ১৪ দিন অবস্থান করলেন। এ সময়ে সমবেত মুসলমানদের প্রচেষ্টায় কোবায় একটি মসজিদ নির্মিত হলো। হযরত কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এই মসজিদই ইসলামের প্রথম মসজিদ। এই কারণে কোবার মসজিদ মুসলমানদের কাছে বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ।

চতুর্দশ দিবসে হযরত তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে মদিনা নগরীতে প্রবেশ করলেন। সেদিন ছিলো শুক্রবার। পথে বনি সালেম গোত্রের মহল্লায় এসে হযরত সমবেত মুসলমানদের নিয়ে জুমআর নামাজ আদায় করলেন। ইসলামের ইতিহাসে এই হলো প্রথম জুমআর নামাজ।

এই বছর (৬২২–৬২৩খৃঃ) থেকে হিজরী সালের গণনা শুরু হলো। অতঃপর মদিনা প্রবেশের পালা।

মদিনাবাসীদের মধ্যে আজ শুধু সাজ সাজ রব।

চারদিকে আনন্দের বন্যা।

আজ তিনি আসছেন।

আজ মহানবী আসছেন।

আজ বিশ্ব–মানবতার বন্ধু আসছেন।

পথের দুধারে সারি সারি মানুষ।

ঘরের দরোজায় মানুষ। ছাদে মানুষ।

শুধু মানুষ আর মানুষ।

সবার আগে দাঁড়িয়ে আছে শিশুরা।

নগরীতে মহানবীর প্রবেশ মুহূর্তে সর্বাগ্রে তাঁকে স্বাগত জানাবে এই ক্ষুদে নাগরিকেরাই।

তাদের সকলের কণ্ঠে ঐকতান ঃ

'হে আল্লাহ্‌র রসুল', 'হে আল্লাহ্‌র রসুল'।

খুশবু, শিশু আর রমণী।
এ তিনের প্রতি রসুলুল্লাহ্‌র আজন্ম পক্ষপাত।
শিশুদের দেখেই তিনি আনন্দে উদ্বেল।
দুহাত বাড়িয়ে তিনি একেকজন শিশুকে তুলে নিচ্ছেন কোলে।
তাদের কচি গন্ড ভরিয়ে তুলছেন আদরে-সোহাগে।
অভ্যর্থনা–মুখর মদিনা নগরী।
তার মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে হযরতের উট।
চলতে চলতে উটটি আপনা আপনি এসে থামলো এক মহল্লায়।
মহল্লাটি বনু নাজ্জার গোত্রের।
যে বাড়ির সম্মুখে থামলো, সেটি আবু আইউবের বাড়ি।
বাড়িটি দোতলা, সুপ্রশস্ত, বেশ খোলামেলা।
হযরত মুহম্মদ (সঃ) আবু আইউবের আতিথ্য গ্রহণ করলেন।
হযরতের ইচ্ছানুসারে বাড়ির এক তলাতেই তাঁর থাকার ব্যবস্থা হলো।
মহানবীর জীবন যেন আবার নতুন করে শুরু হতে লাগলো।

তিনি চোখ মেলে তাকালেন তাঁর চারপাশে। না, কোথাও কোনো বিরোধিতা নেই। নেই কোনো প্রকাশ্য শত্রুতা।
মক্‌কা আর মদিনা।
জন্মভূমি আর কর্মভূমি।
হযরত অবাক হয়ে ভাবলেন, কিন্তু কত তফাৎ আজ এই দুই নগরীতে।

৩৫

শৃঙ্খলা আর সংগঠন।
এ–দুয়ের মধ্যেই নিহিত আছে সাফল্যের চাবিকাঠি।
অতএব মহানবী আলস্যে গা এলিয়ে দিলেন না।
তিনি তাঁর অনুসারীদের সংগঠিত করার উদ্যোগ নিলেন।

মদিনাবাসী মুসলমানরা বললেন, আমরা আপনার আদেশে অগ্নিকুন্ডে লাফিয়ে পড়তেও প্রস্তুত। আমাদের সাহায্যের হাত সব সময়ই সুপ্রসারিত। আমরা আনসার, আমরা সাহায্যকারী।

মদিনায় হযরত প্রথমেই নির্মাণ করলেন একটি মসজিদ।

সেই মসজিদের পাশেই নির্মিত হলো তাঁর বাসভবন।

ছোট্ট, অপরিসর একটি ঘর।

পরবর্তীকালে এই মসজিদই খ্যাত হলো মসজিদে নববী নামে।

হযরত এই মসজিদে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়তেন।

এই মসজিদে বসেই ধর্মীয় আলোচনায় মিলিত হতেন।

আবার এই মসজিদে বসেই তিনি মদিনাবাসীদের সমস্যাদি সমাধান করতেন।

মসজিদে নববী ছিল একাধারে বিচারালয়, উপাসনালয় ও শাসনালয়।

পাশাপাশি হযরত নজর দিলেন মদিনার অর্থনীতির দিকেও।

মদিনাবাসীরা মূলত কৃষিজীবী।

বাণিজ্য খুব একটা তাদের ধাতে সয় না।

অতএব মক্কা থেকে আসা মুজাহিরদের দেয়া হলো বাণিজ্যের কাজ।

ফলে একই সঙ্গে প্রসার লাভ করলো দুটোই।

একটি অপরটির সম্পূরক হয়ে উঠলো।

মুহাজির ও আনসার।

একজন মক্কা থেকে আগত, অন্যজন খাস মদিনাবাসী।

একজন নিমন্ত্রিত, অন্যজন নিমন্ত্রণকারী ।

একজন অতিথি, অন্যজন মেজবান।

কিন্তু দূরদর্শী হযরত ভাবছিলেন অন্যকথা।

তিনি ঘোষণা করলেন, মুহাজির ও আনসার দুইটি পৃথক সত্তা নয়।

এদের পরিচয় আসলে একটিই।

সেই পরিচয়ের সূত্র ভ্রাতৃত্ব।

আজ থেকে মুহাজির ও আনসার পরস্পর ভাই ভাই।

ইসলামের ইতিহাসে তথা মানবজাতির ইতিহাসে

এ এক অভূতপূর্ব ঘটনা। ভ্রাতৃ–বন্ধনের এমন ঘটনা

ইতিহাসে ক্বচিৎ মেলে।

হযরতের ঘোষণা শুনে প্রত্যেক আনসার মুহাজিরদের মধ্য থেকে একজন করে ভাই বেছে নিলেন।

সেই ভাইকে নিজের বাড়িতে বসবাসের সুযোগ দিলেন।

চাষবাসে, কাজ-কর্মে অংশ গ্রহণের সুবিধা দিলেন।

এমনকি, ক্ষেত্র-বিশেষে, সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করলেন।

এই ঐক্যবোধ, এই মানব-মিলনের ফলে ত্বরান্বিত হলো ইসলামের পরবর্তী সাফল্য।

এই সময়েই হযরত আজানের বিধান দিলেন।

নামাজের প্রতি ওয়াক্তে আজান দেওয়ার রেওয়াজ চালু হলো।

মুসলমানদেরকে নামাজের জন্য সমবেত করানোই আজানের মূল উদ্দেশ্য। হযরত বেলাল ইসলামের প্রথম মোয়াজ্জিন নিযুক্ত হলেন।

বেলালের দীর্ঘ ও প্রলম্বিত কণ্ঠের সুমধুর আজান-ধ্বনি আরব-মরুর আনাচে কানাচে ইসলামের মহিমা ঘোষণা করতে লাগলো।

এর কিছুদিন পরে পরিবর্তিত হলো কেবলা।

এতদিন মুসলমানরা নামাজ পড়তেন জেরুজালেমের মসজিদের দিকে মুখ করে। কেবলা পরিবর্তনের ফলে তাঁরা মক্কার কাবাগৃহের দিকে মুখ করে নামাজ পড়তে শুরু করলেন।

সেই আজান আর সেই কেবলা।

আজ পর্যন্ত মুসলমানরা এই রীতিই মেনে চলছে।

৩৬

মদিনায় বাস করতো মূলত চার শ্রেণীর লোক :

আনসার, মুনাফিক, পৌত্তলিক আর ইহুদী।

প্রধানত আওস ও খাজ্‌রাজ্‌ সম্প্রদায়ভুক্ত মুসলমানরাই ছিল আনসার বা সাহায্যকারী। মদিনায় তারাই ছিল ইসলামের প্রকৃত হিতাকাঙ্ক্ষী।

মুনাফিকরা কপটবিশ্বাসী। মুখে তারা ইসলামের সমর্থন করলেও আসলে তারা ছিল পুতুল-পূজারী। মুসলমানদের মধ্যে গা ঢাকা দিয়ে গোপনে তারা মুসলমানদের ক্ষতিসাধন করতে তৎপর ছিল। খাজ্‌রাজ্‌ বংশীয় আবদুল্লাহ্‌ বিন-ওবাই-বিন সলুল মুনাফিকদের নেতা। সে ছিল উচ্চাভিলাষী। তার মনে মদিনার নেতৃত্ব লাভের আকাঙ্ক্ষা ছিল প্রবল। হযরতের আগমনে তার আশা দুরাশায় পরিণত হলো। তাই তলে-তলে ফন্দি আঁটতে লাগলো, কি করে হযরত মুহম্মদ ও তাঁর সঙ্গীদের ঘায়েল করা যায়।

পৌত্তলিকরা মদিনার আদি অধিবাসীদের অন্যতম। ইসলামের শক্তি দিন দিন বৃদ্ধি পেতে দেখে তারা শঙ্কিত ও ঈর্ষান্বিত হলো।

ইহুদীরা হযরতকে ভেবেছিল 'মসীহ্‌'। কিন্তু যতই দিন যেতে থাকলো, ইহুদীরা বুঝলো, তাদের দলে ভেড়ার মতো ব্যক্তি অন্তত মুহম্মদ নন। তারাও পৌত্তলিকদের মতোই ইসলামকে প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি ভেবে শঙ্কিত ও ঈর্ষান্বিত হলো।

হযরত সব শ্রেণীর লোকের সম্পর্কেই অবহিত হলেন। চিরদিন তিনি বিরোধিতা করেছেন সংঘর্ষের, বিরোধিতা করেছেন যুদ্ধ-বিগ্রহের ; পক্ষান্তরে, জোর দিয়েছেন বিভিন্ন জাতির শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের ওপর। বিভিন্ন শ্রেণীর মদিনাবাসীদের মধ্যে এই সহাবস্থান তখন একটি অতি প্রয়োজনীয় বিষয়। কেননা মুসলমানরা তখনো সংখ্যায় অল্প। হযরত জানতেন, একদিন না একদিন মক্‌কাবাসী কোরেশরা মদিনাবাসীদের উপর প্রতিশোধ নিতে আসবে। একদিন না একদিন মুসলমানরা আক্রান্ত হবেই হবে।

হযরত মদিনার প্রত্যেক শ্রেণীর নেতৃস্থানীয় লোকদের সঙ্গে কথা বললেন। তাঁর মুখের উপর কেউ না বলতে সাহস করলো না। রচিত হলো শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের এক অনন্য সনদ। এই সনদের বিষয়বস্তু নিম্নরূপ :

১ ইহুদী, নাসারা, পৌত্তলিক ও মুসলিমসহ মদিনার সব শ্রেণীর লোক এক রাষ্ট্রভুক্ত ও এক দেশবাসী।

২ প্রত্যেক ধর্মীয় সম্প্রদায় স্ব স্ব ধর্ম পালন করবে, কেউ কারো ধর্মে হস্তক্ষেপ করবে না বা বাধা দেবে না।

৩ হত্যার বিনিময়ে নিহত ব্যক্তির আত্মীয়কে ক্ষতিপূরণ বাবদ অর্থ দেওয়ার রেওয়াজ প্রচলিত থাকবে।

৪ সকল শ্রেণীর লোক সমান অধিকার ভোগ করবে।

৫ শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হলে সবাই একযোগে মদিনাকে রক্ষা করবে।

৬ মদিনার কোনো সম্প্রদায়ের লোক বহিরাগত শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হলে সব সম্প্রদায় আক্রান্ত সম্প্রদায়কে সাহায্য করবে।

৭ এক সম্প্রদায় শত্রুর সঙ্গে সন্ধি করলে অন্যান্য সম্প্রদায়ও সেই সন্ধি মেনে চলবে।

৮ সব সম্প্রদায় বন্ধুত্ব বজায় রাখবে এবং সমান অধিকার ভোগ করবে।

৯ মদিনা একটি সাধারণতন্ত্র। এই সাধারণতন্ত্রের সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে সংঘটিত যাবতীয় বিবাদ বিসংবাদ নিষ্পত্তির ভার হযরত মুহম্মদের (সঃ) উপর ন্যস্ত থাকবে।

সনদ রচিত হলো।

রচিত হলো বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন। মদিনায় প্রতিষ্ঠিত হলো ইসলামিক সাধারণতন্ত্র। উত্থান ঘটলো মুসলিম রাজনৈতিক শক্তির। আর সর্বসম্মতিক্রমে হযরত নির্বাচিত হলেন জগতের প্রথম ইসলামি রাষ্ট্রের প্রথম রাষ্ট্রপতি।

৩৭

হযরতের আশঙ্কা সত্যে পরিণত হলো। মক্কাবাসী কোরেশরা মদিনায় এই মুসলিম রাষ্ট্রের অস্তিত্ব মেনে নিতে পারলো না। এদিকে ইহুদীরা আবার নিজেদেরকে বিশ্বাসঘাতক বলে প্রমাণ করলো।

তারা গোপনে কোরেশদের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলো।

ঠিক এই সময়ে, হিজরী প্রথম বর্ষে, হযরত জেহাদের আদেশ লাভ করলেন ঃ

'আল্লাহ্‌র পথে তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করো যারা তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করে। তবে সীমা লঙ্ঘন করো না, কারণ আল্লাহ্‌ সীমা লঙ্ঘনকারীকে ভালোবাসে না।' — (২ ঃ ১৯)

হযরত বুঝলেন, এবার শত্রুকে রুখে দাঁড়াতে হবে। অস্ত্র ধরতে হবে সত্য ও ন্যায়ের সপক্ষে। ফিরিয়ে দিতে হবে আক্রমণকারীর আঘাত।

এরই নাম জেহাদ। এরই নাম ধর্মযুদ্ধ।

হযরত যখন জেহাদের জন্য প্রস্তুত, তখনি দেখা গেলো, কোরেশরা মদিনার আশেপাশে এসে লুটতরাজ করছে। চুরি করছে মুসলমানদের গৃহপালিত পশু।

হযরত কোরেশদের অভিসন্ধি বুঝতে চেষ্টা করলেন। তিনি ঠিক করলেন, মক্‌কার আশেপাশে, মক্‌কা ও মদিনার সংযোগ-পথে, মরুভূমিতে — সর্বত্রই তিনি সংবাদ-সংগ্রাহক দল পাঠাবেন। তাদের কাজ হবে শত্রুদের, বিশেষত কোরেশদের সম্পর্কে সংবাদ সংগ্রহ করা।

এই সময়ে হযরত মদিনার আশেপাশে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করলেন। শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানই এই সন্ধির মূল উদ্দেশ্য। তবে এ মর্মেও বোঝাপড়া হলো যে, তাদের যে কেউ বাইরের শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হলে অন্যান্য সম্প্রদায় সাহায্য নিয়ে এগিয়ে আসবে।

সংবাদ-সংগ্রহ অভিযান বেশ কার্যকর প্রমাণিত হলো। শত্রুদের গতিবিধি ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিভিন্ন খবরাখবর পাওয়া গেলো। এরই মধ্যে ঘটে গেলো এক অঘটন।

রজব মাস।

সিরিয়া থেকে বাণিজ্য শেষে চারজন মক্‌কাবাসী ফিরছে স্বদেশে। মক্‌কার

অদূরে তারা হঠাৎ রসুলুল্লাহ্‌র এক সংবাদ–সংগ্রাহক দলের সামনে পড়ে গেলো। আবদুল্লাহ্‌–বিন–জাহাশের নেতৃত্বে এই দলে সদস্য ছিল মোট বার জন।

বেগতিক দেখে তারা বণিকদের আক্রমণ করে বসলো। একজন নিহত হলো, দু'জন বন্দী। একজন কোরেশ পালিয়ে মক্কায় পৌঁছলো। সংবাদ–সংগ্রাহক দল লুণ্ঠিত দ্রব্য ও বন্দীদের নিয়ে মদিনায় ফিরে এলো। নিহত কোরেশের নাম আমর–বিন–আল–হাজরামী। সে কোরেশনেতা হার্‌ব–বিন–উমাইয়ার বন্ধু।

কোরেশরা এই ঘটনাকে কিছুতেই মেনে নিতে পারলো না। রজব মাসে রক্তপাত রীতিবিরুদ্ধ। মুসলমানরা সেই চিরাচরিত রীতিকে লঙ্ঘন করেছে। কোরেশ–নেতাদের মনে প্রতিশোধের বহ্নি দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো।

কোরেশরা হযরতের হিজরতের পর থেকেই যুদ্ধাস্ত্র যোগাড় করে আসছে। অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই তারা যুদ্ধের আয়োজন সম্পূর্ণ করলো।

৩৮

এতো সাজসজ্জা, এতো আয়োজন, এতো লোকবল।

কোরেশরা তবু বিজয় সম্পর্কে নিশ্চিত হতে চায়।

কোরেশ–প্রধান আবু সুফিয়ান ঠিক করলো, সিরিয়া থেকে আরো অস্ত্রশস্ত্র আনতে হবে। একটি সুসজ্জিত বাহিনী নিয়ে যদি মুসলমানদের আক্রমণ করা যায়, তাহলে তাদের সহজেই নির্মূল করা যাবে।

হযরত সংবাদ–সংগ্রাহকের মুখে সবই শুনলেন।

শুনলেন, আবু সুফিয়ান পঞ্চাশ হাজার মুদ্রা নিয়ে সিরিয়ায় অস্ত্র কিনতে গেছে।

বিচক্ষণ হযরত মুহূর্তেই কর্তব্য ঠিক করে ফেললেন।

তিনি পরামর্শ-সভা ডাকলেন।

মদিনাবাসীদের বুঝিয়ে দিলেন আসন্ন বিপদের কথা।

আবু সুফিয়ান অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সিরিয়া থেকে ফিরে আসার পরই কোরেশরা প্রকাশ্যে যুদ্ধ ঘোষণা করবে মুসলমানদের বিরুদ্ধে। অতএব তাদের রণ-প্রস্তুতিতেই বাধা দিতে হবে।

হযরতের সঙ্গে সবাই একমত।

না, মদিনার উপর দিয়ে মদিনাবাসীদের বিরুদ্ধে ব্যবহারের জন্যে অস্ত্র নিতে দেওয়া যাবে না। হযরত কিছু সৈন্য মদিনা নগরীর রক্ষার কাজে নিয়োজিত রাখলেন। অন্যরা সবাই আবু সুফিয়ানকে বাধা দেওয়ার জন্যে নগরীর বাইরে গেলেন। হযরতের সঙ্গে মোট ৩১৩ জন যোদ্ধা। তাদের মধ্যে দু'জন মাত্র অশ্বারোহী।

মহানবী মদিনা থেকে কিছু দূরে বদর প্রান্তরে এসে আবু সুফিয়ানের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলেন। বদর প্রান্তরে মুসলমান বাহিনী এমনভাবে অবস্থান নিলো, যাতে কোনো যাত্রীদল সহজে তাঁদের অবস্থান বুঝতে না পারে। প্রান্তরের একমাত্র ঝর্ণাটিও তাঁদের অধিকারে রইলো। আবু সুফিয়ান অত্যন্ত ধুরন্ধর ব্যক্তি। সে মুসলমানদের প্রস্তুতি পূর্বেই জেনে গেলো। সঙ্গে সঙ্গে খবর পাঠালো কোরেশনেতা আবু যহলের কাছে। সাহায্য চাই, চাই লোকবল আর অস্ত্রবল।

আবু যহল যেন ক্রোধে অন্ধ হয়ে গেলো। তার হাঁকডাক আর হুংকারে শুরু হলো যুদ্ধের প্রস্তুতি। একহাজার সৈন্যের একটি সুশিক্ষিত বাহিনী এগিয়ে চললো মদিনা অভিমুখে। তার মধ্যে ১০০ জন অশ্বারোহী। নিশ্চিত বিজয়ের লক্ষ্যে গর্বোদ্ধত চরণে এগিয়ে চললো এই বিশাল বাহিনী। হযরতের চাচা আব্বাসসহ তাঁর আরো অনেক নিকট-আত্মীয় এই যুদ্ধে মুসলমানদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করলো।

ওদিকে আবু সুফিয়ান ততদিনে ভিন্ন পথে মক্কা এসে পৌঁছেছে। তার সঙ্গে হযরত বা আবু যহল — কোনো পক্ষেরই মোলাকাত হলো না। পথিমধ্যে কোরেশরা শুনলো, আবু সুফিয়ান নিরাপদে ফিরে এসেছে। কিন্তু ইসলামের চির শত্রু আবু যহল তো দমবার পাত্র নয়। এমন সুযোগ জীবনে কবার আসে। শিশু ইসলামকে ধরাপৃষ্ঠ থেকে মুছে ফেলার এই তো সময়।

বদর প্রান্তরে এসে কোরেশরা মুসলমানদের মুখোমুখি তাঁবু গাড়লো। হযরত এই বিশাল বাহিনী দেখে বিস্মিত হলেন।

তিনি তো যুদ্ধ-প্রস্তুতি নিয়ে আসেন নি। তিনি তো এসেছিলেন আবু সুফিয়ানকে বাধা দিতে। কোরেশদের বিরাট বাহিনী দেখে তিনি পুনরায় সকলের সঙ্গে পরামর্শ করলেন। মদিনাবাসী আনসারগণ একবাক্যে যুদ্ধ করার কথা বললেন। মুজাহিদদেরও তা-ই মত। অবশেষে হযরত যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নিলেন।

এই সময় নাজিল হলো এক অহি।
হযরত আসন্ন বিজয়ের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পেলেন।
হযরতের মনে আর কোনো দ্বিধাই রইলো না।
হোক না শত্রুপক্ষ সংখ্যায় তিনগুণ।
হোক না বেশুমার তাদের অস্ত্রশস্ত্র।
ঈমানের অস্ত্রে বলীয়ান মুসলমানদের কাছে শত্রুর সংখ্যা ও অস্ত্র ভাবনার বিষয় বলেই গণ্য হলো না।
হিজরী দ্বিতীয় সাল। ৬২৩-২৪ খৃস্টাব্দ।
রমজান মাসের ২৭ তারিখ।
মাত্র এক বছর আগেই হযরত লাভ করেছেন রোজা ও যাকাতের বিধান। সিয়াম-সাধনারত মুসলমান যোদ্ধারা এগিয়ে গেলেন শত্রুর দিকে। কিন্তু হযরতের আদেশে মুসলমানরা প্রথমে আঘাত করা থেকে বিরত থাকলেন।

আবু যহল মুসলমানদের সংখ্যা ও অস্ত্রশস্ত্র সম্পর্কে জেনে নিলো। তারপর বিজয় নিশ্চিত জেনে যুদ্ধ শুরু করার আদেশ দিলো।

প্রথমেই শুরু হলো দ্বন্দ্ব–যুদ্ধ। কোরেশদের মধ্য থেকে ওৎবা, তার ভাই শায়বা ও পুত্র অলিদ এসে মুসলমানদেরকে যুদ্ধে আহ্বান জানালো।

মদিনাবাসী তিনজন আনসার তাদের মোকাবেলা করার জন্যে উঠে দাঁড়ালেন। কিন্তু হযরত তাঁর পরমাত্মীয় হামজা, আলী ও ওবায়দাকে যুদ্ধ করার নির্দেশ দিলেন।

শুরু হলো তুমুল দ্বন্দ্ব–যুদ্ধ।

মহাবীর আলীর এক আঘাতেই নিহত হলো অলিদ।

সিংহপুরুষ হামজার হাতে নিহত হলো ওৎবা স্বয়ং।

ওবায়দার হাতে নিহত হলো শায়বা। কিন্তু পঁয়ষট্টি বছরের বৃদ্ধ ওবায়দাও মারাত্মকভাবে আহত হলেন। অল্পক্ষণ পরে তিনিও শাহাদত বরণ করলেন।

মুসলমানদের বিজয়ে কোরেশরা মরিয়া হয়ে উঠলো। আর দ্বন্দ্ব–যুদ্ধ নয়। শুরু হলো সমবেত যুদ্ধ।

একদিকে সংখ্যার জোর, অন্যদিকে ঈমানের শক্তি।

শির দেগা, নাহি দেগা আমামা।

দেখা যাক, কে হারে কে জেতে।

মো'আজ ও আবদুল্লাহ্।

দুজন তরুণ মুসলমান। সত্যের দুজন নিবেদিতপ্রাণ সৈনিক।

তাঁরা বেরিয়ে গেলেন আবু যহলের খোঁজে।

সেই প্রচন্ড যুদ্ধের মধ্যেও তাঁদের লক্ষ্য আবু যহলের শির।

বিদ্যুৎগতিতে তাঁরা আবু যহলকে আক্রমণ করে বসলেন।

বাধা দিলো আবু যহলের পুত্র ইকরামা।

মো'আজ তাঁর বাম হাত হারালেন।

একটিমাত্র হাত সম্বল করেই তিনি যুদ্ধ চালিয়ে যেতে লাগলেন। তাঁর আঘাতে আবু যহলের দেহ তখন ভূ-লুণ্ঠিত।

আবদুল্লাহ্ দেখলেন, আবু যহল ভূ-লুণ্ঠিত, কিন্তু জীবিত।

আবদুল্লাহ্র তরবারির এক আঘাতে আবু যহলের শির দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলো।

নিহত হলো ইসলামের সবচেয়ে বড় শত্রু।

আবু যহলকে নিহত হতে দেখে কোরেশরা রণে ভঙ্গ দিলো।

যুদ্ধে ৭০ জন কোরেশ নিহত ও অনেকেই বন্দী।

পক্ষান্তরে মুসলমান পক্ষে শহীদ হলেন মাত্র চৌদ্দ জন।

মুসলমানদের এই বিজয় ইসলামের ইতিহাসে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। এই বিজয়ের মধ্য দিয়েই ইসলাম পৃথিবীর বুকে সত্যিকারের একটি শক্তি হিসেবে জায়গা করে নিলো।

বিজয়ীর বেশে হযরত মদিনা ফিরে এলেন।

কিন্তু এসেই শুনলেন এক চরম দুঃসংবাদ।

তাঁর প্রিয় কন্যা রোকাইয়া আর ইহজগতে নেই।

মহানবী আল্লাহ্র দরবারে হাজার শোকরিয়া আদায় করলেন।

বদর-যুদ্ধে বিজয়ের ফলে মদিনার ইহুদী ও পৌত্তলিক সম্প্রদায় ভীত হয়ে পড়লো। তাদের মধ্যে বিশ্বাসঘাতকতা নতুনভাবে মাথাচাড়া দিলো। একদল ইহুদী প্রতিনিধি গোপনে মক্কায় গিয়ে কোরেশদের সঙ্গে মিলিত হলো। ইহুদীদের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী গোত্র বনু কানুইকা। তারা মুসলমানদেরকে নানাভাবে উত্যক্ত করতে আরম্ভ করলো। ফলে তাদের সঙ্গে সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে পড়লো। হযরত চেষ্টা করলেন সমঝোতায় পৌছতে। কিন্তু কোরেশদের সঙ্গে ইতিপূর্বেই বনু কানুইকার গোপন চুক্তি হয়ে গেছে। তারা হযরতের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করার সিদ্ধান্ত নিলো।

উপায়ান্তর না দেখে হযরত যুদ্ধের প্রস্তুতি নিলেন। ইহুদীরা আশ্রয় নিলো

সুরক্ষিত দুর্গে। না, মুসলমানদের সঙ্গে সম্মুখ-সমরে লড়াই করার মতো সাহস ওদের নেই। হযরত দু'সপ্তাহ ইহুদীদের দুর্গ অবরোধ করে রাখলেন। দু'সপ্তাহ পর ইহুদীরা হার মানলো।

মহানুভব হযরত মুহম্মদ (সঃ) ওদের কাউকে আঘাত করলেন না, বন্দী করলেন না। নিজেদের বিচার তারা নিজেরাই করলো। বনু কানুইকা গোত্রের সকল ইহুদী মদিনা ছেড়ে চলে গেলো।

৩৯

বদর-যুদ্ধের পর এক বছর কেটে গেছে।
কিন্তু কোরেশদের মনে প্রতিহিংসার আগুন নেভে নি।
আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে তিন হাজার সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী যাত্রা শুরু করলো মদিনার পথে।
বদর প্রান্তরে পরাজয়ের প্রতিশোধ তারা নেবেই নেবে।
হযরত সবই শুনলেন।
কিন্তু ভীত হলেন না।
তিনি কোরেশদের কিভাবে মোকাবেলা করতে হবে, সে সম্পর্কে সকলের পরামর্শ নিলেন। পৌত্তলিক নেতা আবদুল্লাহ্-বিন-উবাই-র সঙ্গেও আলাপ হলো। তারাও মদিনা নগরীকে রক্ষা করার ওয়াদা করলো।
এবার যুদ্ধের কৌশল সম্পর্কে আলোচনা। প্রবীণরা বললেন, নগরে থেকেই যুদ্ধ করা সমীচীন। কোরেশরা নগরে ঢোকার চেষ্টা করলে নগরের ভেতর থেকে তার প্রত্যুত্তর দিতে হবে। কিন্তু বেঁকে বসলো তরুণরা। তারা বললো, আমরা ভীরু নই, কাপুরুষ নই। আমরা নগরীর বাইরে গিয়েই কোরেশদের বাধা দেবো। শেষে তরুণদেরই জয় হলো। সাতশ মুসলমান ও তিনশ পৌত্তলিক সেনা, মোট এক হাজার সৈনিকের একটি বাহিনী নিয়ে এগিয়ে চললেন মহানবী। আজ তিনি সেনাপতি।
এবারও শত্রুপক্ষ সংখ্যায় তিনগুণ।

তদুপরি, তাদের মধ্যে আছে ২০০ জন অশ্বারোহী।
মুসলমানদের অশ্বারোহী নগণ্য।
কিন্তু ঈমানের বলে বলীয়ান মুসলিম বাহিনী।
আল্লাহ্ তাঁদের পরম সহায়।
কিছুদূর যেতেই বেঁকে বসলো আবদুল্লাহ্-বিন-উবাই।
বিশ্বাসঘাতকতা করলো হযরতের সাথে।
তিনশ অনুসারী নিয়ে সে কেটে পড়লো।
কিন্তু মহানবী নিরাশ হলেন না।
মাত্র সাতশ সৈন্য নিয়েই তিনি এগিয়ে চললেন।
মদিনা থেকে তিন মাইল দূরে ওহোদ প্রান্তর।
হযরত এখানে এসেই ঘাঁটি গাড়লেন।
ইতঃপূর্বেই কোরেশরা ওহোদ প্রান্তরে এসে পড়েছে।
পরদিন সকালে যুদ্ধ শুরু হলো।

প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী প্রথমেই দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ।
হযরত আলী ও হযরত হামজার হাতে পর পর দু'জন কোরেশ-বীর প্রাণ দিলো।
তারপর শুরু হলো সমবেত যুদ্ধ।

সংখ্যায় কম হয়েও মুসলমানরা কোরেশদের তাড়িয়ে নিলো।
হামজা, আলী ও অন্যান্য মুসলমান বীরের প্রচন্ড মারের মুখে কোরেশ যোদ্ধারা ছত্রভঙ্গ প্রায়। প্রাণভয়ে ওরা পিছু হটছে।

মুসলমানরা দেখলো, বিজয় তাদের নাগালের মধ্যে।
তারা নিজস্ব যুদ্ধাবস্থান ছেড়ে লুণ্ঠনে প্রবৃত্ত হলো।
আর ঠিক তখনি ঘুরে গেলো যুদ্ধের মোড়। কোরেশ-বীর খালেদের নেতৃত্বে তার অশ্বারোহী বাহিনী পেছন দিক থেকে আক্রমণ করলো লুণ্ঠনরত মুসলমান সেনাদের। হতভম্ব মুসলমানরা প্রাণভয়ে ছুটোছুটি আরম্ভ করলো। মুহূর্তের মধ্যে বিজয় পরাজয়ে পর্যবসিত হলো।

হযরত হামজাসহ প্রায় ৭০ জন মুসলমান—বীর শহীদ হলেন। এমনকি স্বয়ং হযরত মুহম্মদও (সঃ) মারাত্মকভাবে আহত হলেন। তাঁর মুখের দুটি দাঁত ভেঙে গেলো। এক অলৌকিক উপায়ে তিনি নিশ্চিত মৃত্যুর দ্বার থেকে ফিরে এলেন।

কোরেশদের মধ্যে নিহত হলো মাত্র ২৩ জন যোদ্ধা। বিজয়ীর বেশে তারা মক্কা ফিরে যেতে মনস্থ করলো।

ওহোদ যুদ্ধে মুসলমানদের এই অভাবিত পরাজয় তাঁদের ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য একটি চরম শিক্ষা।

যুদ্ধ-শেষে মুসলমানরা ফিরে এলেন মদিনায়। ঘরে ঘরে কান্নার রোল। ভাইহারা, পিতৃহারা, পতি ও সন্তানহারা নারীর গগনবিদারী ক্রন্দন। ঠিক তখনি হযরত খবর পেলেন, কোরেশরা মক্কা ফিরে যায় নি। তারা আবার মদিনার দিকেই আসছে। খবর শুনেই ক্লান্ত, শ্রান্ত ও শোকার্ত মদিনাবাসী যেন নতুনভাবে জেগে উঠলেন।

এবার যে-কোনো মূল্যে কোরেশদেরকে হঠাতেই হবে। এক বিশাল বাহিনী নিয়ে হযরত পরদিনই কোরেশদের মোকাবেলা করার জন্যে এগিয়ে গেলেন।

কোরেশরা ভেবেছিলো, তাদের আক্রমণের কথা শুনে মুসলমানরা ভয় পাবে, বশ্যতা স্বীকার করবে। কিন্তু যখন দেখলো, তাদের ধারণা ভুল, তখন তারাই ভীত হয়ে পড়লো।

আবু সুফিয়ান তাঁর সেনাবাহিনী নিয়ে পুনরায় মক্কার পথ ধরলো।

ওহোদ যুদ্ধে মুসলমানদের পরাজয়ে অনেকেই খুশী। ইহুদীরা আর পৌত্তলিকরা তো বটেই। মদিনার আশেপাশে ছোট বড় অনেক অমুসলিম গোত্র। তারাও মুসলমানদের প্রতি প্রকাশ্য শত্রুতা শুরু করলো। হযরত এদের বিরুদ্ধে ছোটখাট সেনাদল পাঠাতে আরম্ভ করলেন।

এই সময়কার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা, ইহুদী গোত্র বনি নাজিরের বহিষ্কার। এই গোত্রের লোকেরা মহানবীকে আলোচনার জন্যে আমন্ত্রণ জানালো। উদ্দেশ্য, কৌশলে হযরতকে হত্যা করা। ইহুদী নেতা কা'ব এই ষড়যন্ত্রের হোতা।

হযরত সব জানতে পারলেন। তিনি বনি নাজিরকে মদিনা ছেড়ে চলে যেতে বললেন। বনি নাজির হযরতের আদেশে কর্ণপাত করলো না। বাধ্য হয়েই মুসলমানরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলো। তিন সপ্তাহ অবরুদ্ধ থাকার পর বনি নাজির আত্মসমর্পণ করে বিনা অস্ত্রে মদিনা ছেড়ে চলে গেলো।

হযরত এসময় সমাজ-সংস্কারে মনোযোগ দিলেন। মদ্যপান সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ঘোষিত হলো।

তার এক বছর পরে, অর্থাৎ পঞ্চম হিজরীতে তালাক, ইদ্দত, তায়াম্মুম প্রভৃতির বিধান নাজিল হলো। তাছাড়া ব্যভিচারের শাস্তি সম্পর্কেও কঠোরভাবে হুঁশিয়ারি প্রদান করা হলো। নারীদের জন্যে পর্দা প্রথা বিধিবদ্ধ হলো।

এসময় কিছু লোক বিবি আয়েশার চরিত্রে কলঙ্ক লেপনের অপচেষ্টা চালায়। এমনকি লোকমুখে শুনতে শুনতে হযরতের মনেও কিছুটা সন্দেহ দেখা দেয়। ঠিক তখনই নাজিল হলো অহি। বিবি আয়েশা সমস্ত অপবাদ থেকে মুক্ত বলে প্রমাণিত হলেন।

৪০

পঞ্চম হিজরীতেই সংঘটিত হলো খন্দকের যুদ্ধ।

ওহোদের যুদ্ধে পরাজিত কোরেশবাহিনী শেষবারের মতো মরণ-ছোবল হানার জন্যে প্রস্তুত। তারা বুঝতে পারলো, মুসলমানরা সংখ্যায় অল্প

হলেও অজেয়। পর পর দুটি যুদ্ধের অভিজ্ঞতা আবু সুফিয়ানকে ভাবিত করে তুললো।

আবু সুফিয়ান একজন বিচক্ষণ ব্যক্তি। সে এবার সারা আরব থেকে সৈন্য সংগ্রহ করতে শুরু করলো। সঙ্গে সঙ্গে হযরতের বিরুদ্ধে চললো অপপ্রচার। আরবের সব গোত্রকে একযোগে মহানবীর বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলাই তার উদ্দেশ্য।

হযরত ইতোমধ্যেই আরবের অনেক গোত্রের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছেন। ছোটখাট সে-সব অভিযান। প্রায় প্রতিটি অভিযানেই মুসলমানরা বিজয়ী হয়েছেন। হামরা-উল-আসাদের অভিযান, সালমার অভিযান, ইবনে আসিবের অভিযান, জাতের-বোকার অভিযান, দুমাতুল-বন্দলের অভিযান, আসহাব অভিযান — এমনি আরো কতো অভিযান। ফলে মুসলমানদের শক্তি সম্পর্কে আরবের সকলেই মোটামুটিভাবে অবহিত ছিলেন।

আবু সুফিয়ান আরবের প্রায় প্রত্যেক গোত্র থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে সাড়া পেলো। তৈরি হলো দশহাজার সৈন্যের এক সুবিশাল বাহিনী। অগণিত অস্ত্র, উট, লোকলস্কর আর রসদসম্ভার। বীরদর্পে আবু সুফিয়ান মদিনার দিকে রওনা দিলো।

গোড়া থেকেই হযরত কোরেশদের রণপ্রস্তুতির কথা জানতেন। মদিনা থেকে বের হয়ে আসা এবার তিনি নিরাপদ মনে করলেন না। সাহাবীদের পরামর্শ সভায় এক অভিনব যুদ্ধ-পদ্ধতি অনুমোদিত হলো।

সালমান ফারসী ছিলেন হযরতের একজন একনিষ্ঠ সেবক। তিনি মদিনার চারপাশে পরিখা খনন করে আত্মরক্ষা সুদৃঢ় করার প্রস্তাব দিলেন। রসুলুল্লাহ্ কালবিলম্ব না করে এই প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। সমবেত মদিনাবাসী তাঁর সঙ্গে একমত হলেন।

দিনরাত পরিশ্রম করে মদিনার চারপাশে পরিখা খননের কাজ শেষ করা

হলো। হযরত নিজেও এই পরিখা খননে অংশ নিলেন। প্রায় দশহাত গভীর ও দশহাত প্রস্থ এই পরিখা শত্রুদের জন্যে চরম বিস্ময়ের ব্যাপার হয়ে অপেক্ষা করলো।

আবু সুফিয়ান ভেবেছিলো, মুসলমানরা বদর বা ওহোদের প্রান্তরে তাদের বাধা দেবেন। কিন্তু নির্বিঘ্নে মদিনার কাছাকাছি আসতে পেরে তার মনে নানা ভাবের উদয় হলো। সে খুশী হয়ে ভাবলো, কোরেশদের বিরাট বাহিনী দেখে মুসলমানরা সত্যি ভড়কে গেছে।

কিন্তু মদিনা প্রবেশের মুখে এসেই তাদের বিস্ময়ের আর শেষ নেই। পরিখা, পরিখার পাশে প্রাচীর, প্রাচীরের উপর তীরন্দাজ সেনা। না, কোনোমতেই এগোবার কোনো উপায় নেই। অবশেষে কোরেশরা মদিনা অবরোধের সিদ্ধান্ত নিলো। কিন্তু বেশীদিন অপেক্ষা করা তাদের ধৈর্যে কুলোলো না। পরিখা পার হয়ে প্রাচীর ভেদ করে কোরেশরা মদিনা প্রবেশের জন্যে আক্রমণ শুরু করলো। কিন্তু বিফল হলো। চোরাগোপ্তা পথে প্রবেশের চেষ্টা করে আমর নামক একজন কোরেশ–বীর হযরত আলীর তরবারির আঘাতে নিহত হলো। কোরেশরা সে পথও পরিহার করলো।

এদিকে দশ হাজার সৈন্যের রসদ যোগানো চাট্টিখানি কথা নয়। যতই দিন যেতে লাগলো, ততই তাদের রসদপত্র ফুরিয়ে আসতে লাগলো। দেখতে দেখতে কোরেশবাহিনী সম্পূর্ণ হতাশ হয়ে পড়লো।

একদিন রাতে আকাশ ছেয়ে গেলো ঘন মেঘে। শুরু হলো প্রবল বৃষ্টি আর ঝটিকাপ্রবাহ।

পরদিন প্রভাতে দেখা গেলো, কোরেশদের তাঁবু শূন্য, চারপাশে খা খা বিরান প্রান্তর। ইতঃস্তত ছড়ানো কোরেশদের পরিত্যক্ত মালপত্র। খন্দকের যুদ্ধে বিজয়ের সাথে সাথে মুসলমানদের শক্তি অরো আরো সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলো।

স্বীকৃত হলো ইসলামের সামরিক শক্তিমত্তা।

খন্দক যুদ্ধের পর পরই হযরত অভিযানে বের হলেন। তিনি দেখতে চাইলেন, কোরেশরা সত্যি পালিয়েছে নাকি আশে পাশে কোথাও ঘাপটি মেরে আছে।

কোথাও কোরেশদের পাত্তা পাওয়া গেলো না। হযরত তখন অগ্রসর হলেন ইহুদীগোত্র বনি কোরাইজার বিরুদ্ধে। এই বনি কোরাইজা বার বার মুসলমানদের সঙ্গে শত্রুতা করেছে, বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। কিন্তু মুসলমানরা বার বার ইহুদীদেরকে ক্ষমা করেছেন। যুদ্ধে পুরো গোত্রই বন্দী হলো।

সাদ–বিন–মাজ নামে একজন বর্ষীয়ান ব্যক্তিকে ইহুদীরা তাদের বিচারক মনোনীত করলো। সাদ ছিলেন আউস গোত্রের লোক। আউস গোত্রের সঙ্গে ইহুদীদের সবিশেষ আত্মীয়তা ছিলো।

বিচারে ইহুদীর ধর্মগ্রন্থ তওরাতের বিধান মতে পুরুষদের প্রাণদন্ড দেওয়া হলো, নারী ও শিশুদের দাস–দাসী রূপে ব্যবহার করার নির্দেশ দেওয়া হলো, আর তাদের বিষয়–সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হলো।

মহানবী অন্তরে ভীষণ ব্যথিত হলেন। ইহুদীদের করুণ পরিণতি তাঁর মর্মে আঘাত হানলো। একজন ইহুদী বন্দিনী রায়হানাকে হযরতের সহধর্মিনীর মর্যাদা দিলেন। দাসীর প্রতি এমন ব্যবহার ইতিহাসে একটি দুর্লভ ঘটনা। কিন্তু এরই নাম ইসলামিক সাম্যবাদ।

৪১

ষষ্ঠ হিজরী।

হিজরতের পর প্রায় অর্ধযুগ অতিবাহিত হয়েছে।

মদিনাবাসী মুহাজিরদের মন ক্রমেই উচাটন হয়ে ওঠে।

মনে পড়ে কতো কথা, কতো স্মৃতি।

মক্কা। প্রিয়ভূমি মক্কা।

শৈশবের মক্কা। যৌবনের মক্কা।
স্বর্গাদপি গরিয়সী মাতৃভূমি মক্কা।

গভীর রাতে মদীনার আকাশে চাঁদ ওঠে।
জোছনার উচ্ছল বন্যায় ভেসে যায় মরুভূমির বিস্তীর্ণ প্রান্তর।
শিশিরবিন্দুর মতো মুহাজিরদের চোখে জমে বিন্দু বিন্দু ছোট অশ্রু।
মন চায় পাখি হয়ে উড়ে যেতে।

মহানবীর মনও আর্দ্র হয়ে ওঠে।
আবু বকর, ওসমান, ওমর, আলী —
এঁদের সকলের মনোবেদনা তাঁর অজানা নয়।
অবশেষে মুহাজির–আনসার নির্বিশেষে সকল মদিনাবাসীর সঙ্গে তিনি আলোচনায় বসলেন। বললেন, আমরা মক্কা যাবো। ঠিক হলো, এবছর হজ্জের সময় সবাই মক্কার উদ্দেশ্যে রওনা হবেন।
হজ্জ শেষে সবাই আবার ফিরে আসবেন মদিনায়।

যথাসময়ে সম্পন্ন হলো প্রস্তুতি।
দেড় হাজার সঙ্গী, সত্তরটি কুরবানির উট।
এই নিয়ে শুরু হলো যাত্রা।
মক্কাবাসীরা শুনলো, হযরত মক্কার দিকে আসছেন।
সঙ্গে এক বিশাল বাহিনী।
পবিত্র জিলকদ মাসে তো সব হানাহানিই নিষিদ্ধ।
তবে কেন মুসলমানদের এ যুদ্ধযাত্রা ?
কোরেশরা হযরতের গতিরোধ করার জন্যে এগিয়ে গেলো।

কোরেশদের পরিকল্পনা হযরতের অজানা রইলো না।

তিনি কোরেশবাহিনীকে পাশ কাটিয়ে সবার অলক্ষ্যে মক্কার অদূরে হোদায়বিয়ায় এসে তাঁবু গাড়লেন। অযথা সংঘর্ষ ও রক্তপাত এড়ানোই তাঁর উদ্দেশ্য। কেরেশরা যখন একথা জানতে পারলো, তখন তাঁরা অন্য

আশঙ্কায় অস্থির। মক্কা প্রায় অরক্ষিত। সমস্ত কোরেশ সেনা মুসলমানদের গতিরোধ করতে নগরীর বাইরে এসে গেছে। এ সময় মুহম্মদের পক্ষে মক্কায় প্রবেশ করা খুবই সোজা।

কিন্তু মহানবী সুযোগ পেয়েও মক্কায় প্রবেশ করলেন না। কোরেশরা নগরে ফিরে অবাক হয়ে দেখলো, হযরত মক্কায় ঢোকেন নি। তিনি হোদায়বিয়াতেই অবস্থান করছেন।

এ ঘটনায় মক্কার কোনো কোনো গোত্রের ভিতর ভাবান্তর দেখা দিলো। তারা ভাবলো, মুহম্মদ নিশ্চয়ই যুদ্ধ করতে আসে নি। তা না হলে মুহম্মদ এমন সুযোগ কাজে লাগালো না কেন?

কোরেশরা বিষয়টি সম্পর্কে নিশ্চিত হতে চাইলো। 'বোদায়েল' নামক এক ব্যক্তিকে পাঠানো হলো হযরতের কাছে। বোদায়েল একজন পৌত্তলিক। তবু তার সাথে হযরতের বেশ সদ্ভাব ছিলো।

হযরতের সঙ্গে আলাপের পর বোদায়েল মক্কাবাসীদের গিয়ে বললো, 'মুহম্মদ যুদ্ধ করতে আসে নি। এসেছে হজ্জ্ব করতে।' কোরেশদের সন্দেহ তবু ঘোচে না। তারা এবার পাঠালো ওরওয়াকে। ওরওয়াও ফিরে এসে জানালো একই কথা। একে একে মক্কার বিভিন্ন গোত্র থেকে লোক এলো। তারা প্রত্যেকেই মুসলমানদের আগমনের উদ্দেশ্য জেনে যেতে লাগলো। কিন্তু ফিরে গিয়ে সকলেই বললো এক কথা। সকলের মনেই অলক্ষ্যে প্রবাহিত হচ্ছে পরিবর্তনের হাওয়া।

এবার মুসলমানদের পক্ষ থেকে দূত গেলো কোরেশদের কাছে। প্রথমে খেরাশ নামক একজন সাহাবী। তারপর ওসমান। দু'জনের সঙ্গেই কোরেশরা দুর্ব্যবহার করলো। হযরত তবু দমলেন না । নিরাশ হওয়ার লোক তো তিনি নন। প্রতিদিন আলোচনা চলতে লাগলো। হযরত ধৈর্যভরে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

ইতোমধ্যেই মক্কাবাসী অনেক গোত্র হযরতের উপর দুর্বল হয়ে পড়েছে। তারা ভাবলো, মুহম্মদ তো সত্যি সত্যিই যুদ্ধ করতে আসে নি। তাহলে

অযথা তাঁর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করা কেন? ক্রমেই মক্কার জনমত হযরতের পক্ষে ভারী হতে লাগলো। উপায়ান্তর না দেখে কোরেশ নেতৃবৃন্দ হযরতের কাছে সন্ধির প্রস্তাব পাঠালো। হযরতও মনে মনে এই-ই চেয়েছিলেন।

কোরেশরা সন্ধির জন্যে কতগুলি সুনির্দিষ্ট শর্ত দিলো। মুসলমানদের মধ্যে অনেকেরই তা মনঃপুত হলো না। তাঁরা ভাবলেন, এধরনের হীন শর্তে সন্ধি করা কাপুরুষতা।

কিন্তু বিচক্ষণ হযরতের মনে তখন অন্য ভাবনা। তিনি যে-কোনো শর্তে মক্কাবাসী কোরেশদের সঙ্গে সন্ধি করতে রাজী হলেন।

১লা জিলকদ, হিজরী ষষ্ঠ সাল।

হুদায়বিয়ার প্রান্তরে মুসলমান ও কোরেশদের মধ্যে সন্ধি স্বাক্ষরিত হলো। হযরত আলী স্বহস্তে এই সন্ধিপত্র রচনা করলেন। এই সন্ধিপত্রের শর্তাবলী নিম্নরূপ ঃ

১ মুসলমানরা এবার হজ্জ্ব না করে মদিনায় ফিরে যাবে।

২ আসছে বছর তারা হজ্জ্ব করবে। সে সময় তিনদিন কোরেশরা নগর ছেড়ে অন্য জায়গায় আশ্রয় নেবে।

৩ মুসলমানরা আত্মরক্ষার জন্যে তলোয়ার ছাড়া অন্য কোনো অস্ত্র সঙ্গে আনবে না। তরবারি সব সময় কোষবদ্ধ থাকবে।

৪ মক্কায় বসবাসকারী মুসলমানদেরকে মদিনায় নিয়ে যাওয়া যাবে না।

৫ মদিনার কোনো লোক মক্কা এসে আশ্রয় নিলে কোরেশরা তাকে মুহম্মদের নিকট ফেরত দেবে না। কিন্তু মক্কাবাসী কোনো লোক মদিনায় আশ্রয় নিলে তাকে কোরেশদের কাছে ফেরত দিতে হবে।

৬ আরবের যে-কোনো গোত্র মুহম্মদের সঙ্গে বা কোরেশদের সঙ্গে পৃথকভাবে সন্ধি করতে পারবে।

৭ দশ বছরের জন্যে কোরেশ ও মুসলমানদের মধ্যে যুদ্ধ বন্ধ থাকবে।

কোরান শরীফে এই সন্ধিকে বলা হয়েছে, মুসলমানদের মহাবিজয়। এই সন্ধির ফলে হযরত স্বাধীনভাবে ধর্ম প্রচারের সুযোগ পেলেন। হযরত মুহম্মদ (সঃ) যে একজন সত্যিকারের অজেয় ব্যক্তি, এ চুক্তির মাধ্যমে কোরেশরা তাই স্বীকার করে নিলো। হযরতের এই সন্ধি এই কারণে তাৎপর্যময় যে, ইসলাম শান্তির ধর্ম। হযরত সেই শান্তির নবী। হিজরতের পর এই প্রথম তিনি শান্তির মুখ দেখলেন। তাছাড়া, যে-কোনো মূল্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা করাই তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য। হুদায়বিয়ার সন্ধির ফলে তিনি সারা আরবে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে স্থির পদক্ষেপে এগিয়ে গেলেন।

মক্কা থেকে ফিরেই হযরত নিজের কর্তব্য স্থির করে ফেললেন। ঘরের শত্রু বিভীষণরা আর নেই। তাদের কেউ বিতাড়িত, কেউবা নিশ্চিহ্ন। চিরশত্রু কোরেশদের যদ্ধংদেহী মনোভাবও আজ থেমে গেছে। অতএব এই তো সময়। এই তো সময় সারা বিশ্বে ইসলামের দাওয়াৎ পৌঁছে দেবার।

হযরত দিকে দিকে তাঁর বার্তাবাহক পাঠাতে মনস্থ করলেন। চীন, পারস্য, রোম, আবিসিনিয়া — এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকা। তিন মহাদেশের এই চার সাম্রাজ্যের চার সম্রাট। প্রথমেই দূত পাঠানো হলো রোমক সম্রাটের কাছে।

রোমক সম্রাট হেরাক্লিয়াস ছিলেন একজন ধর্মজ্ঞ ও সজ্জন ব্যক্তি। তিনি হযরতের পত্র পেয়ে বিষয়টিকে বিশেষ গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করলেন। হযরত যে আল্লাহ্র রসূল, এ সম্পর্কে তাঁর মনে কোনো সন্দেহ রইলো না। কিন্তু রাজনৈতিক কারণে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হলো না। পারস্যের শাসনকর্তা সম্রাট খসরু হযরতের পত্রের প্রতি চরম অবজ্ঞা প্রদর্শন করলেন। পত্রটি ছিঁড়ে কুটি কুটি করার পর তিনি হযরতকে গ্রেফতার করার জন্যে দুজন দূত পাঠালেন। পরোয়ানাসহ দূতদ্বয় মদিনা

এলে হযরত বললেন, 'তোমরা পারস্যে ফিরে যাও। তোমাদের সম্রাট আর জীবিত নেই।' হযরতের কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য বলে প্রমাণিত হলো। সম্রাট খসরু পুত্রের হাতে নিহত হলেন। নতুন পারস্য–সম্রাট বাজান এই ঘটনায় হযরতের প্রতি দুর্বল হয়ে পড়লেন। তিনি কালবিলম্ব না করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেন।

আবিসিনিয়ার শাসনকর্তা সম্রাট নাজ্জাশী। হযরতের পত্রের প্রতি তিনি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করলেন। তবে বিশেষ কারণে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে পারলেন না বলে হযরতের কাছে বিনীতভাবে পত্রের উত্তর দিলেন। তিনি হযরতের অনুরোধ মতো আবিসিনিয়ায় বসবাসরত মুসলমানদেরকে একটি জাহাজে করে মদিনায় পাঠিয়ে দিলেন।

মিসরের রোমান শাসনকর্তা মুকাউকিস। তিনি হযরতের পত্রের উত্তরে তাঁর জন্যে একটি শ্বেত অশ্ব ও দুজন খৃস্টান নারী উপঢৌকন পাঠালেন। একজনের নাম মেরী, অন্যজনের নাম শিরী। মুকাউকিসের পত্রে ইসলামের প্রতি অনুরাগ প্রকাশ পেলো। হযরত মেরীকে স্ত্রীর মর্যাদা দিলেন।

এভাবে তিন তিনটি মহাদেশে ইসলামের আলো ছড়িয়ে পড়লো। আর এই আলোর উৎসে রইল হোদায়বিয়ার সন্ধি।

৪২

হিজরী সপ্তম সাল। ৬২৮–২৯ খৃস্টাব্দ।

খায়বারের যুদ্ধে ইহুদীদের পরাজিত করাই এ বছরের প্রধান ঘটনা। বনি কানুইকা ও বনি নাজির গোত্রের ইহুদীরা আগে থেকেই খায়বারে এসে তাদের জাতি ভাইদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলো। তারা সকলে মিলে মুসলমানদের বিরুদ্ধে শক্তি সঞ্চয়ে মনোনিবেশ করলো। উদ্দেশ্য, মদিনা আক্রমণ করা। ইসলামের দুশমন গোৎফান গোত্রের লোকজনও ইহুদীদের সঙ্গে মিলিত হলো।

হযরত ইহুদীদের বিশ্বাসঘাতকতার খবর পেলেন। যাদেরকে তিনি নিতান্ত দয়া পরবশ হয়ে প্রাণে মারেন নি, সেই তারাই আজ আবার তাঁর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতে যাচ্ছে। তারা ভেবেছে, মুসলমানরা খন্দক যুদ্ধের পর দুর্বল হয়ে পড়েছে।

হযরত ভেবে চিন্তে মনস্থির করলেন। ইহুদীদের বিরুদ্ধে অভিযান চালানো ছাড়া আর কোনো পথ নেই। চৌদ্দশ পদাতিক ও দু'শ অশ্বারোহী সেনা নিয়ে হযরত খায়বার অভিমুখে এগিয়ে চললেন।

মদিনা থেকে খায়বার একশ' মাইলের পথ। খুব দ্রুত মুসলমানরা খায়বারে এসে উপস্থিত হলেন। ইহুদীরা ঘুণাক্ষরেও কোন কিছু টের পেলো না। তারা মুসলমান বাহিনীকে দেখার সঙ্গে সঙ্গেই দুর্গের মধ্যে আশ্রয় নিলো।

মুসলমানরা তিন সপ্তাহকাল দুর্গ অবরোধ করে রাখলো। এই তিন সপ্তাহের মধ্যে বহু খন্ড যুদ্ধ ও সংঘর্ষ হয়েছে। এসব সংঘর্ষে ৯২ জন ইহুদী নিহত হলো, আর শহীদ হলেন ১৯ জন মুসলমান।

তিন সপ্তাহ অবরোধের পর মহররম মাসে ইহুদীরা আত্মসমর্পণ করলো। মহানুভব হযরত মুহম্মদ (সঃ) এবারও তাদের ক্ষমা করলেন। ইহুদীদের উৎপন্ন শস্যের অর্ধেক রাজস্ব হিসাবে মদিনায় পাঠানোসহ আরো কিছু শর্তে সন্ধি–চুক্তি সম্পাদিত হলো। এসময় কিনান নামক একজন ইহুদীর বিধবা স্ত্রী সাফিয়া মুসলমান হয়ে হযরতের সহধর্মিনী হওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করলো। হযরত তার ইচ্ছা পূরণ করলেন। ইহুদীদের সঙ্গে প্রীতির সম্পর্ক স্থাপন এই বিবাহের প্রধান উদ্দেশ্য। শান্তির দূত হযরত এভাবে বিভিন্ন পথে শান্তির সন্ধান করতে লাগলেন।

কিন্তু মানুষের অন্ধত্বের কোনো শেষ নেই। স্বার্থান্ধ মানুষ অনেক কিছু দেখেও দেখে না। এ সময় জয়নব নামক এক ইহুদিনী হযরতকে তার ঘরে নিমন্ত্রণ করলো। সরল বিশ্বাসে হযরত সে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে যথাসময়ে কতিপয় সাহাবাসহ তার বাড়িতে গেলেন। ইহুদিনী অতিথিদের পাতে

বিষ-মিশ্রিত মাংস পরিবেশন করলো। একজন সাহাবা, নাম বশর, এই মাংস খেয়ে মারা গেলেন। হযরত নিজেও এক টুকরা মাংস খেয়েছিলেন। কিন্তু সবাই অবাক হয়ে দেখলো, হযরতের শরীরে বিষক্রিয়ার কোনো লক্ষণ প্রকাশ পেলো না। এক অলৌকিক উপায়ে এবারেও তিনি নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেলেন।

হযরত মদিনা ফিরে এলেন। হুদায়বিয়ার সন্ধির পর ইতোমধ্যেই এক বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে। হযরত এবার প্রতিশ্রুত হজ্জ্ব পালন করার জন্যে প্রস্তুতি নিলেন।

দুই হাজার সঙ্গী আর ষাটটি উট নিয়ে হযরত চললেন মক্‌কার উদ্দেশ্যে। দূর থেকে কোরেশরা দেখলো, হযরত আসছেন। তাঁর সঙ্গীদের কণ্ঠে 'লাব্বায়েক' ধ্বনি। দীর্ঘ সাত বছর পর দু'হাজার মুসলমানের মক্‌কা প্রবেশ। সে এক অপূর্ব দৃশ্য।

তিন দিন ধরে মুসলমানরা মক্‌কায় হজ্জ্বব্রত পালন করলেন। কাবাগৃহে নামাজ পড়লেন। হযরত বেলালের আযানধ্বনি মক্‌কার ঘরে ঘরে প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো।

এ সময় মাইমুনা নাম্নী হযরতের এক দূর-সম্পর্কীয়া বিধবা আত্মীয়া হযরতের কাছে বিয়ের পয়গাম পাঠায়। হযরত তার বাসনা অপূর্ণ রাখলেন না।

তিনদিন পর কোরেশনেতারা মুসলমানদেরকে নগরী ছেড়ে চলে যেতে বললেন। হযরত বৃথা বাক্যব্যয় করলেন না। তিনি শান্তভাবে ও সহাস্যমুখে মদিনা ফিরে আসার জন্যে পা বাড়ালেন।

মায়মুনার বোন-পো মহাবীর খালিদ। যুদ্ধে এই খালিদই কোরেশদের একটি প্রধান স্তম্ভ। কিছুদিন থেকেই তার ভিতর ভাবান্তর লক্ষ্য করা যাচ্ছিলো। হযরত মদিনা পৌঁছানোর কিছুদিনের মধ্যেই খালিদ এসে ইসলাম গ্রহণ করলেন। অতঃপর দীক্ষিত হলেন আমর ইবনুল আস এবং

ওসমান-বিন-তাল্‌হা। একজন কবি, অন্যজন কাবার পুঞ্জি-রক্ষক। এভাবে হযরত মক্‌কাবাসীদের উপর মানসিক বিজয় সম্পন্ন করলেন।

৪৩

হিজরী অষ্টম সাল।

জমাদিউল আউয়াল।

এবার খৃস্টান সম্প্রদায়ের শত্রুতার পালা।

শত্রুতা করলেন সম্রাট হেরাক্লিয়াসও। বিভিন্ন স্থানে ইসলামের বার্তাবাহী মুসলমান দূতদের হত্যা করা হলো। খৃস্ট ধর্ম ত্যাগ করে যারা মুসলমান হচ্ছিলেন, তাঁরা ও রেহাই পেলেন না।

সর্বোপরি, খৃস্টানরা দিমুনা আক্রমণের ষড়যন্ত্রেও মেতে উঠলো।

বাধ্য হয়েই হযরত তার পালিতপুত্র জায়েদের অধীনে তিন হাজার মুসলমান সেনাবাহিনী পাঠালেন খৃস্টানদের বিরুদ্ধে। ইতিহাসে এই অভিযানই মুতা অভিযান নামে খ্যাত।

সিরিয়ার ম'আব নামক প্রান্তরে একলক্ষ খৃস্টান সেনার সঙ্গে তিন হাজার মুসলমান সেনার লড়াই হলো। যুদ্ধে সেনাপতি জায়েদ, সেনাপতি জাফর ও সেনাপতি আবদুল্লাহ্‌ পর পর শাহাদত বরণ করলেন। তারপর মহাবীর খালিদ মুসলমানদের সেনাপতিপদে বৃত হলেন। খালিদের নেতৃত্বে মুসলমানগণ যেন নতুন জীবন ফিরে পেলো। মুসলমানদের মরণপণ আক্রমণে খৃস্টান বাহিনীর যুদ্ধের সাধ চিরতরে মিটে গেলো। খালিদ বিজয়ীর বেশে মদিনা ফিরে এলেন।

দেখতে দেখতে এসে পড়লো রজব মাস। একটি দুঃসংবাদ পেয়ে হযরত বিচলিত হয়ে পড়লেন। মক্‌কার খোজা সম্প্রদায় মুসলমানদের মিত্র। রাতের আঁধারে সেই খোজা সম্প্রদায় কোরেশদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। অসংখ্য লোক নিহত হয়েছে। খোজা সম্প্রদায় এই অন্যায়ের প্রতিকার

চেয়ে হযরতের কাছে পত্র দিলো। মানবতার ডাক উপেক্ষা করা হযরতের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়লো। তিনি কোরেশদের কাছে এই অন্যায়ের প্রতিবাদ দাবি করলেন। বললেন খোজা সম্প্রদায়কে উপযুক্ত অর্থ ক্ষতিপূরণ হিসেবে প্রদান করতে হবে। কোরেশ-নেতা আবু সুফিয়ান এ কথায় কান দিলো না। সে ঘোষণা করলো, হুদায়বিয়ার সন্ধি আমরা মানি না। হযরত দেখলেন, কোরেশরা যুদ্ধ করতে চায়। মুহূর্তেই তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি অত্যন্ত ক্ষিপ্রগতিতে দশ হাজার সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী সাজালেন। শত্রুপক্ষ কোনো কিছু আঁচ করার আগেই এই বিশাল বাহিনী মক্‌কার উপকণ্ঠে এসে হাজির হলো।

আবু সুফিয়ান তো হতবাক।

কোরেশরা রণপ্রস্তুতি নেয়ার সময়ই পেলো না। রাতের বেলা মুসলমানদের শক্তি সম্পর্কে গোপনে সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে স্বয়ং আবু সুফিয়ান মুসলমানদের হাতে বন্দী হয়ে গেলো।

এই ঘটনায় ইসলামের চিরশত্রু আবু সুফিয়ানের মধ্যেও ভাবান্তর ঘটতে শুরু করলো। এতদিন যে দেব-দেবীর পূজা সে করেছে, তাদের ক্ষমতা সম্বন্ধে তার মনেও সন্দেহ দেখা দিলো। হযরত এই সময় আবূ সুফিয়ানের মনোভাব স্পষ্ট বুঝতে পারলেন। তিনি এ-ও বুঝলেন, জ্ঞাত্যাভিমানী আবু সুফিয়ান নিজে থেকে কখনো ইসলাম গ্রহণ করতে না-ও করতে পারে। অতএব তিনি নিজেই আবু সুফিয়ানকে ইসলামের দাওয়াৎ দিলেন। আবু সুফিয়ান এবার কোনো উচ্চবাচ্য করলো না। কোনো তর্ক করলো না। কেবল কাঁপা কাঁপা গলায় উচ্চারণ করলো, 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্'।

হযরতের আলিঙ্গনে আবদ্ধ হলেন আবু সুফিয়ান। আরবের বুকে ইসলামের আর কোনো বড় শত্রু রইলো না। বিনা রক্তপাতে বিজিত হলো মক্‌কানগরী। কাবা শরীফ হয়ে উঠলো ইসলামের পবিত্র পীঠস্থান। প্রতিমার কবল থেকে মুক্ত কাবা ঘরের সুউচ্চ মিনারে প্রতি দিন ঘোষিত

হলো ইসলামের বিজয়ভৈরবী। প্রতিষ্টিত হলো আল্লাহ্র শ্রেষ্ঠত্ব।

অষ্টম ও নবম হিজরীতে সম্পন্ন হলো আরো কিছু অভিযান।

২রা শাওয়াল, ৮ম হিজরী।

হুনায়নের যুদ্ধে মুসলমানরা বিজয়ী হলো হাওয়াজিন নামক এক দুর্ধর্ষ বেদুঈন সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে। এর পরপরই তায়েফে মুসলমানদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হলো। নবম হিজরীর রজব মাসে রোমক সম্রাট হেরাক্লিয়াসের বিরুদ্ধে পরিচালিত হলো তাবুক অভিযান। তাবুক সিরিয়ার একটি প্রদেশ।এই অভিযানে চল্লিশ হাজার মুসলিম সেনার এক বিরাট বাহিনী অংশ গ্রহণ করে। মুসলমানদের বিশাল বাহিনী দেখে তাবুকের খৃস্টান দলপতির জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হয়। অন্যদিকে, রোমক বাহিনীর পশ্চাদপসরণের সঙ্গে সঙ্গে শত শত খৃস্টান ও ইহুদী ইসলামের পতাকাতলে সমবেত হলো। আরবের মরুসীমা পার হয়ে সুদূর সিরিয়া পর্যন্ত ইসলামের বিজয় সম্প্রসারিত হলো। বলা বাহুল্য, তাবুক অভিযানের পর হযরত আর কোনো যুদ্ধে বা অভিযানে অংশ গ্রহণ করেন নি।

বস্তুত পক্ষে নবম হিজরীতেই অবসান ঘটলো সকল বৈরিতার। আরবের প্রায় প্রতিটি গোত্রই ইসলামের উদারতায় অবাক হয়ে গেলো। গোটা আরব জাহানের উপর আজ যাঁর একচ্ছত্র কর্তৃত্ব, তিনি যেন সর্ব আর্দশের এক মূর্ত প্রতীক। হিজরী দশম সালে দলে দলে বিভিন্ন গোত্রের লোক এসে মদিনায় ভিড় জমাতে শুরু করলো। সে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য। মানুষ আসছে, শুধু মানুষ। বন্যার স্রোতের মতো মানুষের এক অন্তহীন স্রোত। সকলেই ঘোষণা করছে, 'মুহম্মদ আল্লাহ্র রসুল'। সকলেই ঘোষণা করছে, আল্লাহ্ই একমাত্র উপাস্য। মহানবী নয়নভরে এ দৃশ্য দেখতে লাগলেন। দেখতে দেখতে ঝাপসা হয়ে গেলো তাঁর দৃষ্টি। চোখদুটো ভরে গেলো অশ্রুতে। তিনি মুখ তুললেন ঊর্ধ্বাকাশে। যিনি আশ্চর্য প্রক্রিয়ায় মানুষের সংকীর্ণ অন্তরকে প্রসারিত করেন, যিনি নীলিমার নীলে, নক্ষত্রের স্পন্দনে

মরু বালুকার ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অবয়বে, অনন্ত নীহারিকাপুঞ্জে সর্ববস্তুতেও থাকেন অমলিন মহিমা নিয়ে চিরবিরাজমান, সৃষ্টির সেই সার্বভৌম অভিভাবকের উদ্দেশ্যে কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ হয়ে উঠলো তাঁর অন্তর। মনে পড়লো সুরা নসরের সেই অমিয় বাণী ঃ

'যখন আল্লাহ্‌র সাহায্য ও বিজয় আসবে, (তখন) আপনি দলে দলে লোকদেরকে ইসলাম ধর্মে প্রবেশ করতে দেখবেন, অতএব আপনি আপনার প্রতিপালকের প্রশংসা কীর্তন করুন এবং তাঁর নিকট ক্ষমা (তওবা) প্রার্থনা করুন, তিনি নিশ্চয়ই ক্ষমাকারী।'

৪৪

দেখতে দেখতেই দশম হিজরী ফুরিয়ে এলো।

এবার হযরত হজ্জ্ব পালনে উদ্যোগী হলেন। জ্বিলকদ মাসের পঁচিশ তারিখে হযরত তাঁর সহধর্মিনী ও লক্ষাধিক সহচর পরিবৃত হয়ে হজ্জ্ব করার জন্যে মক্‌কার উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন। এই হজ্জ্বই হযরতের জীবনের সর্বশেষ হজ্জ্ব। এটি হুজ্জাতুল বিদা বা বিদায় হজ্জ্ব নামে পরিচিত।

মদিনা থেকে ছ' মাইল পথ অতিক্রম করার পর জুল-হালিফা নামক স্থানে সূর্য অস্ত গেলো। সেখানেই সবাই রাত্রি যাপন করলেন। পরদিন ভোরে উঠে সবাই গোসল করে দুই রাকাত নামাজ আদায় করলেন। তারপর প্রত্যেকেই 'ইহরাম' বেঁধে মক্‌কার পথে এগিয়ে চললেন। হাজার হাজার মানুষের কণ্ঠে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো, 'লাব্বায়েক, আমি হাজির'।

জিলহজ্জ্ব মাসের চার তারিখ। সকাল বেলা। হযরত তাঁর অগণিত সহযাত্রী নিয়ে হাজির হলেন মক্‌কাশরীফে। তারপর বিভিন্ন দেশ থেকে মুসলমানরা এসে যোগ দিলেন তাঁদের সাথে। শান্তিকামী মানুষের সে এক অভূতপূর্ব সমাবেশ। মানব জাতির এই মহা সম্মেলনের মহান নেতা হযরত মুহম্মদ মোস্তফা (সঃ)।

হযরত দেখলেন, তাঁর জীবনের ব্রত সম্পন্ন হয়েছে। নবীশ্রেষ্ঠ গ্রন্থের লেখক জনাব মোবিনুদ্দিন আহমদ জাহগীর–নগরীর ভাষায় ঃ

জগদগুরু হযরত মুহম্মদ মোস্তফার জীবনব্রত সম্যকরূপে সম্পাদিত হইল। তিনি যে মহান কার্য সাধনের জন্য ধরাধামে আসিয়াছিলেন সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তায়ালার করুণায় কতিপয় বৎসর মধ্যে তাহা অলৌকিকভাবে সুসম্পন্ন হইল। যে জাতি সভ্যতার নিম্নস্তরে নিমজ্জিত ছিল, যে জাতি কুসংস্কার ও পাপাচার সমাজের অঙ্গীভূত করিয়া রাখিয়াছিল, যে জাতি সুরাপান, ব্যভিচার, নারী হত্যা, শিশু–হত্যা দূষণীয় মনে করিত না, যে জাতি ঐক্যনীতি, ভ্রাতৃভাব ও সাম্যবাদ কল্পনায়ও স্থান দিত না, যে জাতি স্বীয় শৌর্যবীর্য, অত্যাচার, উৎপীড়ন ও রক্তপাতে প্রয়োগ করিত, যে জাতি নারীগণের প্রতি অতি কদর্য ব্যবহার করিত, এমনকি পিতার মৃত্যুর পর বিমাতার উপর স্বত্ববান হইত, যে জাতি জ্যেষ্ঠ সন্তানকে দেবতার সম্মুখে বলিদান ও কন্যাকে জীবন্ত মৃত্তিকাগর্ভে প্রোথিত করিত, যে জাতি পরকালে বিশ্বাস করিত না, কেবল পার্থিব সুখসম্পদের জন্য পৌত্তলিকতা ও জড়োপাসনায় নিমগ্ন থাকিত, যে জাতি শত সহস্র বর্ষব্যাপী ইহুদী ও খ্রীস্টানগণের প্রাণপণ চেষ্টা সত্ত্বেও ধর্মভাব লাভ করিতে সমর্থ হয় নাই, সেই দুর্দান্ত জাতির মধ্যে কতিপয় বৎসরে কি অভাবনীয় পরিবর্তন, কি বিচিত্র ধর্মভাব, কি কল্পনাতীত উন্নতি সাধিত হইল। সত্য, প্রেমময়, অদ্বিতীয় আল্লাহ্র উপাসনা চির প্রতিষ্ঠিত হইল। সকলে এক অবিচ্ছিন্ন সাম্য ভ্রাতৃবন্ধনে আবদ্ধ হইল। বর্বরতার কেন্দ্র সমাজনীতি, ধর্মনীতি ও জ্ঞানবিজ্ঞানের কেন্দ্রে পরিণত হইল। সকলেই 'সত্যমন্ত্রে' দীক্ষিত হইল। বস্তুতঃ যে কার্য একাধারে কোন দেশে, কোনো যুগে সংঘটিত হয় নাই, হযরতের জীবদ্দশায় তাই সংসাধিত হইল। যে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠাকল্পে, মহাপুরুষগণ ভগ্নমনোরথ হইয়াছেন, ভূতলে সেই স্বর্গরাজ্য শেষ

রসুল প্রতিষ্ঠিত করিলেন। সেই মাতৃপিতৃহীন বালক আজ এই পার্থিব স্বর্গরাজ্যের অধীশ্বর। তাঁহার পবিত্র ব্রত অক্ষরে অক্ষরে সম্পাদিত হইল।

তারপর এলো তাওয়াফের পালা। মহানবী লক্ষ লক্ষ অনুসারীকে নিয়ে সাতবার কাবাগৃহ প্রদক্ষিণ করে 'মকামে ইবরাহীমে' এসে দুই রাকাত সালাত আদায় করলেন। তারপর আরাফাত প্রান্তরে সমবেত জনতার উদ্দেশ্যে তিনি অভিভাষণ প্রদান করলেন। অভিভাষণের মূল বক্তব্য নিম্নরূপ ঃ

সমবেত হে আমার প্রিয় ভক্তবৃন্দ, আজ আমি তোমাদেরকে যা বলবো তা মনোযোগ দিয়ে শোনার চেষ্টা করো। আমার মনে হচ্ছে, তোমাদের সঙ্গে একত্রে হজ্জ্ব করার সুযোগ আমার জীবনে আর না–ও আসতে পারে।

আমি ঘোষণা করছি, আঁধার যুগের সমস্ত কুসংস্কার, সব অন্ধ বিশ্বাস, সব অনাচার আজ থেকে অবসিত হলো। জগতের সমস্ত মিথ্যা আজ থেকে বাতিল হয়ে গেলো।

আজ থেকে অবসান হলো সকল বৈরিতার। গোত্রে গোত্রে, মানুষে মানুষে হানাহানি, শোণিত–প্রতিশোধ আর অন্যায় সংঘর্ষ আজ থেকে নিষিদ্ধ করা হলো। আমার স্বগোত্রের প্রাপ্য সকল সুদ ও শোণিতের দাবী আজ থেকে রহিত হয়ে গেলো।

আজ থেকে একজনের অপরাধের জন্যে অন্যকে দণ্ড দেয়া যাবে না। পিতার অপরাধের জন্য পুত্রকে কিংবা পুত্রের অপরাধের জন্য পিতাকে দায়ী করা যাবে না।

আজ থেকে সব মুসলমান ভাই ভাই। আরবে–আজমে কোনো তফাৎ নাই। কেউ ছোট নেই, কেউ বড় নেই। আল্লাহ্‌র চোখে সবাই সমান। কেননা সব মানুষ আদম থেকে এবং আদম মাটি থেকে উৎপন্ন।

নারী জাতির কথা বিস্মৃত হয়ো না। নারীর উপর পুরুষের যতোটুকু অধিকার, পুরুষের উপর নারীরও ততোটুকু অধিকার। নারী জাতির উপর কোনো অবিচার করো না। আল্লাহ্‌কে সাক্ষী রেখে তোমরা প্রত্যেকে তোমাদের স্ত্রীকে গ্রহণ করেছো।

খবরদার। ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করো না। এই বাড়াবাড়ির ফলেই অতীতের অনেক সমৃদ্ধ জাতি আজ লুপ্ত হয়ে গেছে।

প্রত্যেক মুসলমান নরনারীর ধন ও জীবন অত্যন্ত মূল্যবান। তোমাদের প্রত্যেকের ধন ও জীবন আজকের দিনের মতোই পবিত্র।

হে মুসলমানগণ, কখনো নেতার আদেশ লঙ্ঘন করো না। যদি কোনো কর্তিত-নাসা কাফ্রী ক্রীতদাসও তোমাদের নেতা হয়, সে যদি আল্লাহ্‌র কিতাব অনুযায়ী তোমাদের চালনা করে, তাহলে আনত মস্তকে তার আদেশ মেনে চলো।

দাসদাসীর প্রতি সর্বদা সদ্ব্যবহার করো। তাদের উপর কোনোরূপ অত্যাচার করো না। তোমরা তাদেরকে তোমাদের মতোই খাদ্য ও বস্ত্র প্রদান করবে। মনে রাখবে, তারাও তোমাদের মতো মানুষ।

সাবধান। পৌত্তলিকতার পাপ যেন তোমাদের স্পর্শ করতে না পারে। শির্‌ক করো না, চুরি করো না, মিথ্যা বলো না, ব্যভিচার করো না। সব ধরনের পাপ ও মলিনতা থেকে মুক্ত থেকে পবিত্র জীবন-যাপনে ব্রতী হয়ো। চিরদিন সত্যকেই পরম আশ্রয় হিসেবে মেনে নিও।

হে মুসলমানগণ, তোমরা সবসময় আল্লাহ্‌কে ভয় করে চলতে শেখো। তোমাদের অবশ্যই একদিন আল্লাহ্‌র কাছে ফিরে যেতে হবে। তোমাদের যাবতীয় কার্যাবলীর জন্য আল্লাহ্‌র কাছে জবাবদিহি করতে হবে।

কখনো বংশ-মর্যাদার জন্য বড়াই করো না। উপরন্তু নিজের বংশকে হেয় করো না। যে ব্যক্তি নিজের বংশকে নীচ মনে করে, তার উপর

আল্লাহ্‌র অভিশাপ নেমে আসে।

হে আমার অনুসারীবৃন্দ, আমি তোমাদের কাছে আজ যা আমানত রেখে যাচ্ছি, তাকে তোমরা দৃঢ়ভাবে ধারণ করো। তাহলে তোমাদের পতন হবে না। তোমাদের কাছে আমি আজ দুটি জিনিষ আমানত রেখে যাচ্ছিঃ এক. আল্লাহ্‌র কুরআন; দুই. রসুলের সুন্নাহ বা আদর্শ।

একথা নিশ্চিতরূপে জেনে রেখো, আমার পর আর কোনো নবী আসবে না। আমিই সর্বশেষ নবী। 'এলেম' উঠে যাওয়ার আগে আমার নিকট শিখে নাও।

আরাফাতের প্রান্তরে সমবেত হে আমার লক্ষ লক্ষ উম্মতবৃন্দ, তোমরা আমার এই বাণী অনুপস্থিত মুসলমানের কাছে পৌছে দিও। হয়তো উপস্থিত কিছু লোকের চেয়ে অনুপস্থিত কিছু লোক এই বাণী দ্বারা অধিকতর উপকৃত হবে।

অভিভাষণ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মহানবী ঊর্ধ্বাকাশে মুখ তুললেন। তাঁর মুখমন্ডল এক অপরূপ স্বর্গীয় দ্যুতিতে জ্বলজ্বল করছে। আবেগাপ্লুত কণ্ঠে তিনি বললেনঃ হে আল্লাহ, হে আমার মা'বুদ, আমি কি তোমার বাণী পৌছে দিতে পারলাম? আমি কি আমার কর্তব্য সম্পাদন করলাম?

তখন লক্ষ লক্ষ কণ্ঠে গগনবিদারী আওয়াজ উঠলোঃ অবশ্যই, অবশ্যই।

ভক্তি গদগদ কণ্ঠে হযরত তখন বললেনঃ হে আল্লাহ, শ্রবণ করো, সাক্ষী থাকো; সমবেত এই জনতা সাক্ষ্য দিচ্ছে, আমি আমার কর্তব্য পালন করতে পেরেছি।

তখন তিনি সমবেত জনতার উদ্দেশ্যে বললেনঃ আল্লাহ্ যেদিন আমার সম্পর্কে তোমাদের প্রশ্ন করবেন, তোমরা কি সাক্ষ্য দেবে?

লক্ষ্য কণ্ঠে আরাফাতের প্রান্তর প্রকম্পিত করে উত্তর এলো ঃ আমরা সাক্ষ্য দেবো, আপনি আমাদের কাছে আল্লাহ্‌র বাণী যথাযথভাবে পৌছে দিয়েছেন, আপনি আপনার কর্তব্য সম্পন্ন করেছেন।

হযরত তখন ভাব-বিভোর। সেই মগ্ন অবস্থাতেই তিনি আকাশের দিকে অঙ্গুলি তুলে জলদ-গম্ভীর কণ্ঠে বললেন ঃ প্রভু হে শ্রবণ করো, প্রভু হে সাক্ষী থাকো, হে আমার আল্লাহ্‌, সাক্ষী থাকো।

হযরতের অভিভাষণ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আরাফাতের প্রান্তরে নাজিল হলো কুরআনের সর্বশেষ আয়াত ঃ

> তোমাদের মঙ্গলের জন্য তোমাদের ধর্মকে আজ আমি পূর্ণ করে দিলাম এবং তোমাদের প্রতি নিজের নিয়ামতকে সুসমাপ্ত করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের ধর্মরূপে মনোনীত করে দিলাম। (মায়দা – ৩)

হঠাৎ হযরতের কণ্ঠ করুণ হয়ে এলো। লক্ষ জনতার দিকে মুখ ফিরিয়ে হাত নাড়তে নাড়তে তিনি বলে উঠলেনঃ 'আলবিদা ! আলবিদা !' এই একটি ক্ষুদ্র শব্দ লক্ষ লক্ষ ভক্তের হৃদয়ে তীব্রতম শেলের মতো বিদ্ধ হলো।

৪৫

হিজরী একাদশ সাল।

মহানবীর কাজে-কর্মে, চলায়-ফেরায় সব কিছুতেই একটা পরিবর্তন দেখা গেলো। তিনি সব সময় নিজের ভিতর মগ্ন থাকতে লাগলেন, কি যেন চিন্তা করতে লাগলেন। সাহাবাদের চোখে সব কিছুই ধরা পড়লো।

বিদায় হজ্জ থেকে ফেরার পথে তিনি ওহোদ প্রান্তরে এলেন। শহীদদের মাজারের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের রুহের মাগফেরাত কামনা করে বললেন, 'সমাধির ভেতর চির নিদ্রায় শায়িত হে লোক সকল, তোমাদের আত্মার

'উপর আল্লাহ্‌র অন্তহীন করুণা বর্ষিত হোক। আমরাও শিগ্‌গির্‌ তোমাদের সঙ্গে মিলিত হচ্ছি।' মদিনায় এসেও তিনি জান্নাতুল বাকী নামক গোরস্থানে অনুরূপ ভাষায় জিয়ারত করলেন।

এ সময় খবর এলো, সিরিয়ায় বিদ্রোহ দেখা দিয়েছে। হযরত জীবদ্দশায় তার শেষ কর্তব্য করে যেতে মনস্থ করলেন। হযরত জায়েদের সুযোগ্য পুত্র উসামার নেতৃত্বে সিরিয়া অভিযানের নির্দেশ দিলেন। কিন্তু হযরত হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় এই অভিযান স্থগিত হয়ে গেলো।

হযরতের অসুস্থতা ক্রমেই বাড়তে লাগলো। হযরত সকল স্ত্রীর অনুমতি নিয়ে বিবি আয়েশার ঘরে শয্যা গ্রহণ করলেন। বিবি আয়েশা হযরতের সেবায় দিনরাত নিজেকে উৎসর্গ করে রাখলেন।

সফর মাসে হযরত পীড়িত হয়ে পড়েছিলেন। দেখতে দেখতে মাস শেষ হয়ে এলো। সফর মাসের শেষ বুধবারে হযরত বেশ সুস্থ বোধ করলেন এবং গোসল সেরে নিলেন। অতঃপর হযরত আলী ও হযরত আব্বাসের কাঁধে ভর দিয়ে তিনি মসজিদে এসে জোহরের নামাজ আদায় করলেন। মসজিদে তিনি তাঁর জীবনের অন্তিম খোৎবা প্রদান করলেন ঃ

> আল্লাহ্‌তালা তাঁর এক ভৃত্যকে পার্থিব সম্পদ ও পারলৌকিক শান্তি–এ দুয়ের একটি গ্রহণ করতে বলেছিলেন। কিন্তু সে আল্লাহ্‌র নিকট যা আছে, তা–ই চেয়েছে। আমি যাঁর অর্থ ও সংসর্গের জন্য সবচেয়ে কৃতজ্ঞ, তিনি আবু বকর — তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা তাদের নবী ও সাধুপুরুষদের সমাধি উপাসনার স্থানে পরিণত করেছে। তোমরা এরূপ করো না, আমি তোমাদেরকে স্পষ্টভাবে নিষেধ করে যাচ্ছি।

খোৎবা শেষে তিনি উপস্থিত সকল মুসলমানের কাছে নিবেদন করলেন ঃ

> হে মুসলিমগণ, আমি যদি কখনো কারো প্রতি অন্যায় ব্যবহার করে থাকি, অথবা আমার নিকট কখনো কারো কিছু প্রাপ্য থাকে, বল, পরকালে লজ্জিত হওয়ার চেয়ে ইহকালে লজ্জিত হওয়া ভাল।

সফর মাস শেষ হওয়ার পর রবিউল আউয়াল মাস এসে পড়লো। হযরতের পীড়া অপরিবর্তিত রইলো।

পীড়ার সময় হযরত একদিন তাঁর প্রিয় কন্যা বিবি ফাতেমাকে ডেকে কানে কানে কি যেন বললেন, ফাতিমা শুনে ডুকরে কেঁদে উঠলেন। তৎক্ষণাৎ হযরত ফাতিমার কানে কানে আবার যেন কি বললেন। ফাতিমা এবার হেসে উঠলেন। পরে হযরত ফাতিমার কাছে জানা গেলো, মহানবী প্রথমবার তাঁকে তাঁর মৃত্যু-সংবাদ দিয়েছিলেন। দ্বিতীয়বার বলেছিলেনঃ হে ফাতিমা, আমার আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে তুমিই সর্বপ্রথম আমার সঙ্গে মিলিত হবে।

বলা বাহুল্য, হযরতের মৃত্যুর পর তাঁর আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে ফাতিমাই সর্বপ্রথম বেহেশ্‌তবাসী হন।

রবিউল আওয়াল মাসের এগারো তারিখ। হযরতের অবস্থা আশাতিরিক্ত খারাপ হয়ে গেলো। ওজু করতে তাঁর কষ্ট হলো। সে দিন হযরত কোনো মতে মসজিদে উপস্থিত হলেন। জামাতে আবু বকর ইমামতি করলেন।

সারারাত হযরতের খুব কষ্টে কাটলো। কিন্তু ভোরের দিকে এসেই তাঁর অবস্থা বেশ আশাপ্রদ বলে মনে হলো। তিনি আবার একটু হাঁটাচলা করার শক্তি পেলেন। কিন্তু অপরাহ্নেই পীড়ার গতি উল্টো দিকে ঘুরে গেলো। তিনি শেষ বারের মতো শয্যা গ্রহণ করলেন।

বারোই রবিউল আউয়াল, ৭ই জুন, ৬৩২ খৃস্টাব্দ।
বিবি আয়েশা সর্বক্ষণ হযরতের শয্যাপাশে। সর্বক্ষণ তিনি মহানবীর শরীরের কোথাও না কোথাও হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন। একসময় মনে হলো,

হযরতের শরীর যেন নিস্তেজ হয়ে আসছে। আয়েশা স্বামীর মাথা বুকে তুলে নিয়ে হাত দুটো মালিশ করতে লাগলেন।

একসময় নির্লিপ্ত কণ্ঠে হযরত বললেন ঃ আয়েশা, হাত সরিয়ে নাও। চকিতে আয়েশার হাত দুটো থেমে গেলো। স্থির দৃষ্টি মেলে তিনি স্বামীর দিকে তাকিয়ে রইলেন। মহানবীর মুখে স্মিত হাসি। চোখ স্বর্গীয় জ্যোতিতে উজ্জ্বল। তিনি ঊর্ধ্বাকাশে দৃকপাত করলেন। তাঁর কণ্ঠে মৃদু অথচ স্পষ্টভাবে উচ্চারিত হলো ঃ

'হে আল্লাহ্, হে আমার পরম বন্ধু,

এবার তোমার সন্নিধানে'